সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সপ্তত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৭

সপ্তত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অঙ্কানাং বামতো গতিঃ—	ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি	৭০
২।	আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুম্মামস্‌জিদ—তোরণ-লিপি—	শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ	৮১
৩।	কাশীনাথ বিদ্যানিবাস—	মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই	১৭৫
৪।	কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি—	অধ্যাপক শ্রীসক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম্ এ ..	১২৫
৫।	চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন—	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন	৪০
	(ক) "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" সম্বন্ধে বক্তব্য—	৺সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	৫৪
	(খ) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুর বক্তব্য—	.. ...	৫৯
৬।	চিরঞ্জীব শর্ম্মা—	মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই	১৩৪
	'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' আলোচনা—	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৪
৭।	জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা	ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি	২৮
৮।	জ্যামিতিশাস্ত্রের হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার—	ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি	১
৯।	ঝাঁপান—	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য	১৮৭
১০।	নাম-সংখ্যা—	ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি	৭
১১।	বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষ—	ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্ ...	৮২
	ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য—	ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ...	৯৫

১২। বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র—
শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম্ এ ১৭৯
১৩। বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়—
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ... ১৯৩
১৪। ব্রজবুলি—
শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ ১৪৩
১৫। ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (১)—
শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ ২২৬
১৬। ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (২)—
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় বিদ্যারত্ন ২৩২
১৭। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী—
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ৯৯
১৮। লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন—
শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ ২১৬
১৯। শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ
শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী এম্ এ ১৬২
২০। সভাপতির অভিভাষণ—
মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট, সি আই ই ৬১

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[সপ্তত্রিংশ ভাগ]

জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার*

ষড়ায়তন বেদাঙ্গশাস্ত্রের এক আয়তনের নাম 'কল্পশাস্ত্র'। সূত্রাকারে গ্রথিত বলিয়া তাহাকে 'কল্পসূত্র'ও বলা হয়। ঐ কল্পসূত্রেরই অধ্যায় বা অংশবিশেষের নাম 'শুল্বসূত্র'। 'শুল্ব' সংজ্ঞার উৎপত্তি ও তাহার প্রসারের অনুচিন্তন করিলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এক গৌরবময় কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিতে আমরা ইচ্ছা করি।

প্রাচীন হিন্দুজাতির এক বৃহত্তম সম্প্রদায় ছিল যজ্ঞপন্থী। বস্তুতঃ বৈদিক সভ্যতা যজ্ঞের ভিত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞীয় বেদীর নির্ম্মাণ-প্রণালী ও তাহার তত্ত্ব ঐ শুল্বসূত্রেই পাওয়া যায়। ঐ শাস্ত্রের প্রকৃত নাম 'শুল্ব,' 'শুল্বসূত্র' নহে। শুল্ববিষয়ক সূত্রনিবদ্ধ বলিয়াই উহাকে 'শুল্বসূত্র' বলা হয়। মহর্ষি আপস্তম্ব-প্রণীত শ্রৌতসূত্রে আছে,—

"ছন্দশ্চিতমিতি কাম্যাঃ, তে শুল্বেষ্বনুক্রান্তাঃ"[১]

অর্থাৎ "কাম্যযাগ ছন্দশ্চিতি (বেদীতে করিতে হইবে)। তাহা শুল্বে অনুক্রান্ত হইয়াছে।" মহর্ষি বোধায়ন-প্রণীত শুল্বসূত্রের টীকাকার দ্বারকনাথ যজ্বা ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,[২]—

"বৌধায়নীয়শুল্বস্য প্রব্যাখ্যাঃ প্রেক্ষ্য যজ্বনা।
টীকা ভট্টাত্মজেনেয়ং ক্রিয়তে শুল্বদীপিকা॥"

অর্থাৎ "বৌধায়ন-প্রণীত শুল্বের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়া ভট্টাত্মজ (দ্বারকনাথ) যজ্বা কর্ত্তৃক 'শুল্বদীপিকা' (নামক) এই টীকা প্রণীত হইল।" আপস্তম্বশুল্বসূত্রের টীকাকার সুন্দররাজও বহু স্থলে 'শুল্ব' নামে এই শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] 'শুল্বমীমাংসা,' 'শুল্বপরিশিষ্ট' এবং 'শুল্ববার্ত্তিক' প্রভৃতি নামে গ্রন্থাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মূল বিষয়ের নাম 'শুল্ব'।[৪]

প্রাচীন হিন্দুদের জ্যামিতিবিষয়ক জ্ঞান এই শুল্বসূত্রেই সংগৃহীত আছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে যে শাস্ত্রকে 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' বা 'জ্যামিতি' বলা হয়, সম্রাট্ জগন্নাথ যাহাকে 'রেখাগণিত'

---

* ১৩৩৬। ১ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

১। 'আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র', ১৭।২৬।২।

২। 'পণ্ডিত', ৯ম খণ্ড (প্রাচীন পর্য্যায়), ১৮৭৫, ২৯৩ পৃষ্ঠা।

৩। A. Bürk, "Das Apastamba Sulba-sutra," *Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft*, vol. 55, pp. 543 ff and vol. 56, pp. 327 ff.

৪। ইহা বলা উচিত যে, 'শুল্বসূত্রে' মান হিসাবে 'রজ্জু' শব্দেরই সাধারণ প্রয়োগ দেখা যায়, 'শুল্ব' শব্দের উল্লেখ নাই।

বলিয়াছেন,[১] তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু গণিতাচার্য্যগণ যাহাকে 'ক্ষেত্রগণিত' বা শুধু 'ক্ষেত্র' বলিতেন[২], বৈদিক সাহিত্যে তাহাই 'শুল্ব' নামে অভিহিত হইত। অতএব জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রাচীনতম হিন্দু নাম 'শুল্ব'। তাহারই অপর নাম 'রজ্জুসমাস' (বা 'রজ্জু')। মহর্ষি কাত্যায়ন-প্রণীত 'শুল্ব-পরিশিষ্ট' নামক গ্রন্থের প্রথম সূত্র এই প্রকার[৩],—

"রজ্জুসমাসং বক্ষ্যামঃ"

"আমি রজ্জুসমাস বিবৃত করিব।" 'রজ্জু' বা জ্যামিতিবিষয়ক তত্ত্বের যে 'সমাস' বা 'সংগ্রহ,' তাহাই 'রজ্জুসমাস'।

এই 'শুল্ব' এবং 'রজ্জু' নামের উপপত্তি কি ? সংস্কৃত ভাষায় 'শুল্ব', 'রজ্জু' ও 'সূত্র' শব্দ সমানার্থক। চলতি বাংলা ভাষায় তাহাকে 'দড়ী' বা 'সূতা' বলা হয়। প্রাচীন কালে 'রজ্জু' নামে একটা দেশমান ছিল। 'শুল্বসূত্রে'[৪] কৌটিল্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রে'[৫] এবং শিল্পশাস্ত্রে[৬] এই রজ্জুমানের উল্লেখ আছে[৭]। তাহারও কত পূর্ব্বকাল হইতে ঐ মান প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই।[৮] রজ্জু দ্বারা ক্ষেত্রের পরিমাপ হইত। তাই ক্ষেত্র-পরিমাপবিষয়ক শাস্ত্রকেও 'রজ্জু' বা 'শুল্ব' বলা হইত। 'কাত্যায়নশুল্বপরিশিষ্টে'র টীকাকার সূর্য্যদাসাত্মজ রাম স্পষ্টতই এই কথা বলিয়াছেন,—

"শুল্বনং শুল্বঃ শুল্ব্ মানে অস্মাদ্ধাতোর্ঘঞ্চঃ মানকরণমিত্যর্থঃ। ইতি গ্রন্থনাম-নিরুক্তিঃ। শুল্ব্যতে অনেন ইতি বা অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিতি ঘঞ্। তত্র প্রতিজ্ঞা-সূত্রমেতদ্'রজ্জুসমাসং বক্ষ্যাম' ইতি। ক্ষেত্রপরিচ্ছেদিকায়া রজ্জোঃ সমাসঃ সম্যগস্যত ইতি সমাসঃ ক্ষেত্রপরিচ্ছেদানুগতয়া ধারণং তং বক্ষ্যামঃ।"[৯]

এইরূপে দেখা যায় যে, 'শুল্ব' বা 'রজ্জু' সংজ্ঞার অর্থ তিন প্রকার,—(১) দেশপরিমাপক মানবিশেষ, (২) তদ্দ্বারা পরিমাণকরণ, এবং (৩) পরিমাণবিষয়ক শাস্ত্র। ক্ষেত্রের বাহু-রেখাকেও 'রজ্জু' বলা হইত। যিনি 'শুল্বে' পণ্ডিত, তাঁহাকে বলা হয় 'শুল্বজ্ঞ', 'শুল্ববিদ্', 'সমসূত্র-

---

১। সম্রাট্ জগন্নাথ জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজাদেশে তিনি ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে য়ুক্লিডের জ্যামিতির আরবী ভাষান্তর অবলম্বনে এক সংস্কৃত ভাষান্তর করেন। উহার নাম 'রেখাগণিত'। তৎপূর্ব্বে কোন ভারতীয় ভাষায় য়ুক্লিডের জ্যামিতির ভাষান্তর হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ নাই। ১৯০১ সালে বোম্বাই নগরী হইতে কমলাশঙ্কর প্রাণশঙ্কর ত্রিবেদীর তত্ত্বাবধানে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২। ব্রহ্মগুপ্ত (৫২৮), ভাস্করাচার্য্য (১১৫০) ও মহাবীরাচার্য্য (৮৫০) প্রভৃতি হিন্দু গণিতবিশারদগণের গ্রন্থের জ্যামিতিবিষয়ক অংশের নাম 'ক্ষেত্র' বা 'ক্ষেত্রব্যবহার'। জৈনাচার্য্য উমাস্বাতি (১৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সালে)ও "ক্ষেত্র" সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার টীকাকার সিদ্ধসেন (৫৫০ খ্রীষ্ট সালে) "ক্ষেত্রগণিতশাস্ত্রে"র উল্লেখও করিয়াছেন ('তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' ৩।১৩)।

৩। 'পণ্ডিত', ৪র্থ খণ্ড (নব পর্য্যায়), ১৮৮২, ৯৫ পৃষ্ঠা।

৪। 'আপস্তম্ব শুল্বসূত্র', ৬।৪, ৬ ; ৭।৩ ; ৯।৪ ;

৫। 'কৌটিলীয়ং অর্থশাস্ত্রম্', আর্, শামাশাস্ত্রী সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, মহীশূর, ১৯১৯, ১০৭ পৃষ্ঠা।

৬। মানসার, ময়মত ইত্যাদি।

৭। রজ্জুমান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কৌটিল্যের মতে ৪০ হাতে এক রজ্জু। কিন্তু 'মানসার,' 'ময়মত' এবং 'মনুষ্যালয়চন্দ্রিকার' মতে ৩২ হাতে এক রজ্জু।

৮। বেদে 'শুল্ব' শব্দের প্রয়োগ নাই, 'দড়ী' অর্থে 'রজ্জু' শব্দের প্রয়োগ আছে (ঋগ্বেদ ১।১৬২।৫ ; ১০।১৩০।১২ ; যজুর্ব্বেদ-তৈত্তিরীয়সংহিতা, ২।৫।১।৭ ; অথর্ব্ববেদ ৩।১১।৮ ; ৬।১২১।২ ইত্যাদি)।

৯। 'পণ্ডিত', ৪র্থ খণ্ড (নব পর্য্যায়), ১৮৮২, ৯৫ পৃষ্ঠা।

নিরঙ্কক', ইত্যাদি'[১]। 'নিরঙ্কক' অর্থ 'আকর্ষক'; সুতরাং 'সমসূত্রনিরঙ্কক' অর্থ 'সমানসূত্রাকর্ষক'।

শুল্ব ও রজ্জু সংজ্ঞার উপপত্তি ও প্রয়োগরীতি বিচার করিতে গিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের প্রমাণে যে সিদ্ধান্তে এইমাত্র উপনীত হওয়া গিয়াছে, অর্দ্ধমাগধী এবং পালি-সাহিত্যের প্রমাণ দ্বারাও তাহাকে সমর্থন করা যায়। জৈন আগম 'স্থানাঙ্গসূত্রে'র মতে সংখ্যান বা গণিতশাস্ত্রের দশবিধ বিভাগের এক বিভাগের নাম 'রজ্জু'[২]। ঐ গ্রন্থের টীকাকার অভয়দেব সূরি (১০৫০ খ্রীষ্ট সাল) বলেন, "রজ্জু দ্বারা যে পরিমাপকরণ, তাহাকে রজ্জু বলা হয়; তাহাকে (অর্থাৎ তদ্বিষয়ক শাস্ত্রকে) ক্ষেত্রগণিতও বলে।"[৩] 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রে'ও ক্ষেত্রগণিত অর্থে 'রজ্জু' সংজ্ঞার প্রয়োগ আছে[৪]। জৈন গ্রন্থাদিতে 'সূচীরজ্জু', 'প্রতররজ্জু' এবং ঘনরজ্জু' নামে তিন প্রকার দেশমানের উল্লেখ আছে।[৫]

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অনুশাসন-লিপিতে 'রজ্জুক', 'রজ্জূক', 'লজ্জুক' ও 'লজ্জূক' শব্দ এবং তাহাদের নানা বিভক্তিনিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ দেখা যায়।[৬] 'রজ্জুক' ও 'লজ্জূক' এক। কারণ,

---

১। "সংখ্যাজ্ঞঃ পরিমাণজ্ঞঃ সমসূত্রনিরঙ্ককঃ।
সমভূমৌ ভবেদ্বিদ্বান্ শুল্ববিদ্ পরিপৃচ্ছকঃ॥"

টীকাকার রাম এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন।

২। 'স্থানাঙ্গসূত্র', অভয়দেব সূরির টীকা সহিত, মেহেসানার আগমোদয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ৭৪৭ সূত্র। ৩৩৮ সূত্রও দ্রষ্টব্য।

৩। "রজ্জ্বা যৎ সংখ্যানং তদ্রজ্জুরভিধীয়তে, তচ্চ ক্ষেত্রগণিতং"।

৪। 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র', ২য় শ্রুতস্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ১০৪ সূত্র। ঐ গ্রন্থের টীকাকার শীলাঙ্ক (৮৬২ খ্রীষ্টসাল) লিখিয়াছেন—"রজ্জুঃ রজ্জুগণিতং।"

৫। এস্থলে আমরা প্রসঙ্গক্রমে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য ভদ্রবাহু-প্রণীত 'কল্পসূত্রে' আছে যে, ভগবান্ মহাবীর হস্তিপালের "রজ্জুসভা"তে নির্ব্বাণ লাভ করেন (সূত্র ১২২)। ঐ গ্রন্থে 'রজ্জুক' শব্দের প্রয়োগও আছে (সূত্র ১২৩, ১৪৭)। একজন আধুনিক টীকাকার মনে করেন যে, ঐ সকল স্থলে 'রজ্জু' ও 'রজ্জুক' শব্দের অর্থ 'লেখক' (আগমোদয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'কল্পসূত্র' দ্রষ্টব্য)। তাঁহার অনুসরণ করিয়া ঐ গ্রন্থের ইংরাজী ভাষান্তরকারক অধ্যাপক হার্মান যাকোবি লিখিয়াছেন,—'রজ্জুসভা' = office of the writers (*Gaina Sutras* in the Sacred Book of the East Series, vol. 22)। বুলারও সেই অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (ZDMG, vol. 47, p. 466 ff.)। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, 'রজ্জু' ও 'লেখা'র এমন কোন সম্পর্ক নাই, যদ্দ্বারা একের উল্লেখে অপরের কথা মনে আসিতে পারে। বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কোন প্রকারের সম্পর্কের পরিকল্পনাও করা যাইতে পারে না। সুতরাং 'লেখক' অর্থে 'রজ্জু' শব্দের কোন উপপত্তি হয় না। কথিত আছে যে, আচার্য্য ভদ্রবাহু "শ্রুতকেবলিন্" ছিলেন অর্থাৎ সমগ্র জৈনশাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অধিকন্তু তিনি নাকি 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রে'র টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাচীন জৈনশাস্ত্রাদিতে 'রজ্জু' সংজ্ঞা কি অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপেই অবগত ছিলেন। সেই কারণে মনে হয় না যে, তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে এক অসাধারণ এবং অসঙ্গত অর্থে ঐ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা মনে করি যে, তিনি সাধারণ অর্থেই উহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক টীকাকার ভুলক্রমে অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের মতে 'রজ্জুসভা' অর্থ 'ক্ষেত্রপরিমাপকের সভা'। 'ক্ষেত্রের চিত্রাঙ্কনকারী' অর্থে 'লেখক' শব্দ গ্রহণ করিলে টীকাকারের ব্যাখ্যাও সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে, যদিও তাহাতে কতকটা কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু যাকোবি ও বুলারের ব্যাখ্যা কিছুতেই সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে না।

৬। *Corpus Inscriptionum Indicarum*, vol. I—Inscriptions of Asoka, new edition by E. Hultzsch, Oxford, 1925; Third Rock-Edicts of Girnar (*line* 2), Shahabazgarhi (*l.* 6), Dhauli (*l.* 1), Kalsi (*l.* 7); Fourth Rock-Edicts of Lauriya-Araraj (*ll.* 1, 2, 4, 5, 6); Fourth Pillar-Edic of Delhi-Topra (*ll.* 2, 4, 8, 9, 12, 13), etc.

ব্যাকরণের মতে 'র'এর স্থলে 'ল' ব্যবহার করা যায়। আবার প্রাচীন কালে 'রজ্জু' শব্দকে দীর্ঘ ঊকারান্ত করিয়াও লেখা যাইতে পারিত। সুতরাং বস্তুতপক্ষে আমরা একই শব্দ পাইতেছি 'রজ্জুক'। উহার অর্থ 'রজ্জুতত্ত্বজ্ঞ' বা 'রজ্জুধারক', অর্থাৎ 'ক্ষেত্রপরিমাপক'। তাই তাঁহাকে 'রজ্জুগ্রাহক'ও বলা যাইত।[১] যিনি রজ্জু গ্রহণ করেন অর্থাৎ রজ্জুহস্তে যিনি ক্ষেত্রাদির পরিমাণ নির্ণয় করেন, তিনি 'রজ্জুগ্রাহক'।[২] পালি-সাহিত্যে পাওয়া যায় যে, রাজার অমাত্যবর্গের মধ্যে একজন ছিলেন 'রজ্জুগ্রাহকামাত্য'। তিনিই প্রধান ক্ষেত্রপরিমাপক—বর্ত্তমান কালের 'সার্ভেয়ার জেনেরেল'।[৩]

ক্ষেত্রগণিতের প্রাচীনতম হিন্দু নামের পরিকল্পনায় যে ভাব গূঢ় আছে বলিয়া উপরে প্রদর্শিত হইল, হিন্দুস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী অপর জাতির সাহিত্যেও ক্ষেত্রগণিতের নামকরণে তদ্রূপ ভাব নিহিত আছে, দেখা যায়। আরবী ও পারসী ভাষায় ক্ষেত্রগণিতকে 'হন্দস' বা 'ইল্‌ম্ অল্ হন্দস' বলা হয়।[৪] আরবগণ পরবর্ত্তী কালে তাহাকে, গ্রীক নামের অনুকরণে 'জুমাত্রীয়' নামেও অভিহিত করিত। কিন্তু আরবী ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিচিত ক্ষেত্রগণিতের নাম 'বাব-অল্-মিসাহ' (Bab-al-Misahah)। উহা আদি আরব গণিতজ্ঞ অল্-খোয়ারীজ্‌মী (৮২৫ খ্রীষ্ট সাল) প্রণীত বীজগণিতেরই অধ্যায়বিশেষ। ঐ গ্রন্থে 'মিসাহ' সংজ্ঞা তিন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—(১) পরিমাপকরণ, (২) পরিমাপফল অর্থাৎ ক্ষেত্র, এবং (৩) পরিমাপকরণবিষয়ক শাস্ত্র বা ক্ষেত্রতত্ত্ব। 'মিসাহ' শব্দ হিব্রু 'মেষীহ' (Meshihah) শব্দ হইতে উৎপন্ন। হিব্রু জ্যামিতি 'মিষ্‌নাথ্-হ-মিদ্দোথ্' (Mishnath ha Middoth) গ্রন্থে 'ক্ষেত্র' ও 'খাত' অর্থে 'মেষীহ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তল্মূদীয়, সিরীয় প্রভৃতি সমস্ত শেমিতিক ভাষাতেই এই 'মেষীহ' শব্দ পাওয়া যায়। উহার মৌলিক অর্থ 'মানরজ্জু'। হিব্রুগণ উহাকে ক্ষেত্র অর্থেও ব্যবহার করিত।[৫] এইরূপে দেখা যায় যে, এশিয়া মাইনর, আরব ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের প্রাচীন অধিবাসিগণও মানরজ্জু সম্পর্কে ক্ষেত্রগণিতের নামকরণ করিত।

১। কুরুধর্ম্মজাতক, ফৌসবোল সম্পাদিত "জাতক", ২য় খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

২। Cf. Bühler, ZDMG, vol. 47, pp. 466 ff. রজ্জু শব্দের উত্তর স্বার্থে ক প্রত্যয় করিয়া রজ্জুক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শুধু 'দড়ী' অর্থেও রজ্জুক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তিপল্লথাম্গিজাতক, "জাতক", ১ম খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা; কথাসরিৎসাগর।

শিল্পশাস্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে তাঁহাকে 'সূত্রগ্রাহী', কথন বা 'সূত্রধার' বলা হইত। তিনি 'রেখাজ্ঞ' হইতেন। (Binod Bihari Dutt, *Town-Planning in Ancient India*, p. 168).

৩। অশোকের অনুশাসনলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহাকে বিচারকার্য্যও করিতে হইত। ভূমির পরিমাণ, অধিকার ও রাজস্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রজায় প্রজায় ও রাজায় প্রজায় যে বিবাদ বিসম্বাদ হইত, তিনি তাহার বিচারও করিতেন মনে হয়। কিন্তু কুরুধর্ম্মজাতকে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণনা দেখা যায়—"এই ব্যক্তি একদিন কোন জনপদে ক্ষেত্র মাপিবার সময়ে রজ্জুর এক প্রান্ত ক্ষেত্রস্বামীর এবং এক প্রান্ত নিজের হস্তে রাখিয়াছিলেন। রজ্জুর খণ্ডসংলগ্ন প্রান্ত তাঁহার নিজের হস্তে ছিল—" ইত্যাদি (শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ-কৃত ভাষান্তর)।

৪। *The Encyclopaedia of Islam*, the article on *Handasa* by H. Suter.

৫। Solomon Gandz, "On three interesting terms relating to area", *American Mathematical Monthly*, vol. 34, 1927, pp. 80-86.

অপর পক্ষে প্রাচীন গ্রীক ও মিসরীয়গণ ক্ষেত্রগণিতের নামকরণে সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ক্ষেত্রগণিতের গ্রীক নাম 'গেওমেত্রিয়া' (ইংরেজী উচ্চারণে 'জিওমেট্রি')। উহার মৌলিক অর্থ 'ভূ-পরিমাণবিদ্যা'। গ্রীক ভাষায় 'গে' বা 'গী'র অর্থ 'ভূ,' 'পৃথিবী', আর 'মেত্রেইন্'-এর অর্থ 'পরিমাপ করা'। গ্রীক ভাষায় ক্ষেত্রজ্ঞকে 'গেওমেত্রেস্' বা 'ভূ-পরিমাপক' বলা হয়। প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় ক্ষেত্রজ্ঞকে 'হুনু' (Hunu) বলা হইত।[১] উহার মৌলিক অর্থও 'ভূ-পরিমাপক'।[১] গ্রীক পণ্ডিত হিরোডোটাস (৪৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সাল) লিখিয়াছেন যে, আদিতে মিসরদেশ হইতে ক্ষেত্রগণিতশাস্ত্রের চর্চা গ্রীস দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং উহার নাম পরিকল্পনায় গ্রীস ও মিসর দেশে একই তত্ত্ব অনুসৃত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন মিসর দেশে রজ্জুমান ছিল। উহাকে 'খেৎ' (Khet) বলা হইত।[২] কিন্তু ক্ষেত্রগণিতের নামে উহার কোন নিদর্শন ছিল না, ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

এখন প্রশ্ন হইবে যে, রজ্জুমান সম্পর্কে ক্ষেত্রগণিতের নামকরণপ্রথা কি প্রাচীন হিন্দুগণের নিকট হইতে আরব, ইহুদী ও সিরীয়গণ লইয়াছিলেন, না উহাদের কাহারও নিকট হইতে হিন্দুগণ পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীনতম আরবী ক্ষেত্রগণিত ৮২৫ খ্রীষ্ট সালের সমসময়ে রচিত হয়। প্রাচীন হিব্রু জ্যামিতি 'মিষ্নাথ্-হ-মিদ্দোথ্'-এর রচনাকাল অনিশ্চিত। উহার সহিত অল্-খোয়ারীজমীর গ্রন্থের অনেকাংশে মিল আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, উভয় গ্রন্থ কাছাকাছি সময়ে লেখা।[৩] অপরে মনে করেন যে, উহা খ্রীষ্টীয় সালের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে লেখা।[৪] অপর পক্ষে হিন্দু আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র, যাহাতে 'শুল্ব' নামের প্রথম উল্লেখ আছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বহু পূর্ব্বে, খ্রীষ্টীয় সালের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের প্রমাণগুলিও তিন চারি শত খ্রীষ্টপূর্ব্ব সালের। এতদবস্থায় উক্ত নামকরণপ্রথা হিন্দুদের নিকট হইতেই অপর জাতিরা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে। ইহাদের সকলেই অপর কোন জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছিল মনে করিবার কোন প্রমাণ নাই।

ডেমোক্রিটস নামে কোন প্রাচীন ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্ গ্রীক পণ্ডিত একদা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি মিসরীয় 'হার্পেদোনাপ্তাই' হইতেও অধিকতর বিজ্ঞ।[৫] ঐ শব্দ দ্বারা তিনি 'ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্'কেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঐ শব্দের মৌলিক অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলে একটা নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'হার্পেদোনাপ্তই' একটা যৌগিক শব্দ। 'হার্পেদোন' ও 'আপ্তেস্' এই দুইটা গ্রীক শব্দের সমাহারে উহা নিষ্পন্ন। 'হার্পেদোন' শব্দের

১। Brugsch: *Hierogl. Demot. Worterbuch*, p. 967; quoted in Gow's *Short History of Greek Mathematics.*

২। মিসর দেশে ১০০ হাতে এক 'খেৎ' হইত। সুতরাং উহা হিন্দু রজ্জুমান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

৩। D. E. Smith, *History of Mathematics*, vol. 1, P. 174.

৪। সোলোমন গান্ড্‌জ্ এই মত পোষণ করেন। ইহার স্বপক্ষে তিনি কোন বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

৫। Smith, *History of Mathematics*, vol. 1, p. 8.

অর্থ 'রজ্জু' বা 'সূত্র' এবং 'হাপ্টেইন' ধাতুর অর্থ 'আকর্ষণ করা'—'বিস্তৃত করা'। সুতরাং গ্রীক 'হার্পেদোনাপ্তাই' শব্দের মৌলিক অর্থ 'সূত্রাকর্ষক'। অতএব ঐ শব্দটী প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক হইলেও উহার অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব গ্রীক মনোভাবের বহির্ভূত। কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে,গ্রীক ভাষায় ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্‌কে 'গেওমেত্রেস্' বা 'ভূ-পরিমাপক' বলে। অপর পক্ষে ঐ শব্দের মূল তত্ত্ব হিন্দুর ভাবধারার অনুরূপ। 'হার্পেদোনাপ্তাই' শব্দ সংস্কৃত 'সমসূত্রনিরঞ্ছক' শব্দের অনুরূপ। শিল্পশাস্ত্রাদিতে ভূ-পরিমাপককে 'সূত্রগ্রাহী' বলা হয়। এই প্রকারে মনে হয় যে, ডেমোক্রিটস কতকাংশে হিন্দু প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সালের সমসাময়িক লোক। প্রবাদ আছে যে, তিনি ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুর বিজ্ঞানভাণ্ডার হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যদি তাহা প্রকৃত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের চারি শত বছর পূর্ব্বে হিন্দু ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রভাব গ্রীসদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস (৫৪০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সাল) ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র ও ক্ষেত্রতত্ত্ব শাস্ত্রের অংশবিশেষ শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সুতরাং দেখা যায় যে, আদিতে মিসর দেশের ন্যায় হিন্দুস্থানও ক্ষেত্রতত্ত্ববিষয়ে গ্রীসের শিক্ষাগুরু ছিল[১]।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

১। এই বিষয়ে মল্লিখিত Hindu Contributions to Mathematics নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (*Bulletin of the Allahabad University Mathematical Association*, vol. I & II).

নাম-সংখ্যা*

("শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী" বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়-লিখিত "আঙ্কিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি[১]। তাহাতে অনেক নূতন কথা শিখিবার আছে। বিগত পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় তিনি "কবি শকাব্দ" নামে এই বিষয়ে আরও এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রকার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা তাঁহার মত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতেই আশা করা যায়। "শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী" বিষয়ে আমার লেখা[২] এক সাধারণ প্রবন্ধই যে তাঁহাকে উহার আলোচনায় প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে আমার আরও বেশী আনন্দ।

শ্রীযুক্ত রায় উভয় প্রবন্ধেই আমার লেখার কিছু কিছু দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার কোন কোনটা আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়া লইতেছি। উৎপল ভট্ট[৩] "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে একটা শ্লোক অনুবাদ করিয়াছেন,—"খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্ট-শররাত্রিপাঃ" ইত্যাদি। আমার প্রবন্ধে "রাত্রিপাঃ" স্থানে "রাত্রয়ঃ" পাঠ আছে। শ্রীযুক্ত রায় সত্যই বলিয়াছেন যে, আমার দেওয়া পাঠ ভুল। তিনি শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের[৪] অনুবাদিত পাঠ দেখিয়াছেন। সুধাকর দ্বিবেদী প্রকাশিত উৎপলভট্টের মূল গ্রন্থের[৫] সহিতও আমি মিলাইয়াছি। কিন্তু প্রবন্ধে আমি ভুলে কার্ণসাহেবের ধৃত পাঠ দিয়াছি।[৬] উহাতে "রাত্রয়ঃ" আছে। উভয় পাঠের প্রতিলিপিই আমার দপ্তরে ছিল। কার্যকালে তাড়াতাড়িতে ভুল হইয়া গেল। তিনি আমার লেখার অপরাপর যে ত্রুটি দেখাইয়াছেন,তাহাদের উল্লেখ পরে করা যাইবে। তাহার কোন কোনটা আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। উহার কারণও যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

---

* ১৩৩৬।১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৬শ ভাগ, ২৩৫—২৪৮ পৃষ্ঠা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায়ের প্রবন্ধটি আমার নিকট প্রেরিত হয়। তাহাতেই মুদ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে উহা পাঠ করিবার সুযোগ পাই। তাঁহার মত প্রবীণ ও বিজ্ঞ পণ্ডিতের লেখার সমালোচনা ও ত্রুটি প্রদর্শন করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, উহা জানি। তবুও প্রকৃত তথ্য নিরূপণের সহায়তা করিবার জন্য, পরিষদের সভ্য কোন কোন বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি এ স্থলে তাহা করিতে উদ্যত হইলাম। তাঁহার প্রবন্ধটা সাহিত্যের একাংশে দিক্ দর্শনের যন্ত্র হইবে। সেই যন্ত্রটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ করিতে সত্যপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত মনে করি। অবশ্য সেই জন্য যথোপযুক্ত ক্ষমতা আমার নাই, তাহা বিশেষভাবে অবগত আছি। সামান্য যে সাহায্য করিতে পারিতাম, ততটা করিবার মতন অবসরও বর্ত্তমানে নাই। তবুও যাহা মনে আসিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। তাহাতে অপর শক্তিমান্ ও বিজ্ঞতর ব্যক্তির আলোচনার পরিশ্রম কথঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে।

২। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮-৩০ পৃষ্ঠা।

৩। ইহার নাম কেহ লেখেন ভট্টোৎপল, কেহ বা লেখেন উৎপল ভট্ট।

৪। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১৮৯৬ খ্রীষ্ট সাল, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৫। বরাহমিহির-প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা', উৎপল ভট্টের টীকা সহ, সুধাকর দ্বিবেদী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী, ১৮৯৫ খ্রীষ্ট সাল; ২৭ পৃষ্ঠা।

৬। ভট্টকর্ণ (H. Kern) সম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা', কলিকাতা, ১৮৬৫, ভূমিকার ৫০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ যে সকল পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আমি তাহাদের নাম দিয়াছিলাম "শব্দসংখ্যা"। শ্রীযুক্ত রায় দিয়াছেন "আঙ্কিক শব্দ।" প্রাচীন গণিত টীকাকার মল্লিভট্ট (১২৯৯ শককাল) তাহাদিগকে 'নামসংখ্যা' বলিয়াছেন। এই সংজ্ঞাটিই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। 'এক', 'দুই', 'তিন' প্রভৃতি যেমন ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা-চিহ্নের বা অঙ্কের নাম, সেইরূপ 'ইন্দু' (=১), 'কর' (=২) প্রভৃতিও উহাদের নামমাত্র। তাহারা সংখ্যার চিহ্ন বা অঙ্ক নহে। এই তত্ত্বটি 'নামসংখ্যা' সংজ্ঞা দ্বারা যত সহজে পরিস্ফুট হয়, অপরগুলি দ্বারা তত নহে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'এক', 'দুই' প্রভৃতি সাধারণ অঙ্কনামগুলিও কখন কখন এই প্রণালী অনুসারে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তাহাদের এবং পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে এই হিসাবে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 'নামসংখ্যা' সংজ্ঞা তাহাদের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত। তাই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই নামেই আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিব, এবং প্রবন্ধের শিরোনামারূপেও তাহাই ব্যবহার করিলাম। সুপ্রসিদ্ধ গণিতাচার্য্য মহাবীর (প্রায় ৭৭৫ শককাল) উহাদের "সংখ্যা-সংজ্ঞা" বলিয়াছেন[১]। টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা বলিয়াছেন "ভূতসংজ্ঞা"। এই সকল নামও মন্দ নহে।[২]

নামসংখ্যার আলোচনায় প্রধান বিচার্য্য বিষয়,—(১) নামসংখ্যার উৎপত্তিকাল, (২) তাহার কারণ, (৩) স্থানীয়মানের অবতারণাকাল, (৪) বামাগতি (সাধারণরূপে) অবলম্বনের কারণ, (৫) দক্ষিণাগতি (কদাচিৎ) অনুসরণের কাল ও কারণ, (৬) উপযোগিতা, (৭) প্রসার ও প্রতিপত্তি, (৮) প্রতিসংজ্ঞার প্রয়োগেতিহাস, (৯) তাহার উপপত্তি ও মর্ম্মরহস্য ইত্যাদি। আরও একটা বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, একখানি সম্পূর্ণ নিঘণ্টু সঙ্কলন।

ইতিপূর্ব্বে কতিপয় প্রমাণ প্রয়োগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'এক', 'দুই' প্রভৃতি অঙ্কের মূল নামগুলির উল্লেখ দ্বারা তৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট বস্তুবিশেষকে নির্দ্দেশ করিবার প্রথা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। ঐ প্রকারের প্রমাণ বেদে আরও পাওয়া যায়। যথা ঋগ্বেদে[৩] আছে,—

"সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে…"

"স্তোতৃবর্গ-পরিবেষ্টিত ও শংসনীয় পিতার (সোমদেবের) উদ্দেশ্যে সপ্ত (অর্থাৎ সপ্তসংখ্যক ছন্দঃ) উচ্চারিত হইতেছে…।" এ স্থলে 'সপ্ত' সংজ্ঞা দ্বারা তৎসংখ্যক বৈদিক ছন্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সায়ন বলেন,—"সপ্তচ্ছন্দাংসি ক্ষরন্তি"। সপ্ত ছন্দের নাম বেদে প্রসিদ্ধ আছে[৪]।

১। মহাবীরাচার্য্য-প্রণীত 'গণিতসারসংগ্রহ' রঙ্গাচার্য্যের সম্পাদনায়, ইংরাজী ভাষান্তর ও টিপ্পনী সহ, ১৯১২ সালে মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। মান্দ্রাজ সরকারের পাণ্ডুলিপিশালা হইতে আমি 'প্রয়োগরচনা' নামে 'মহাভাস্করীয়ে'র এক টীকার প্রতিলিপি আনাইয়াছি। তাহার প্রথমে এই শ্লোক আছে,—

"অক্ষরসংজ্ঞা জ্ঞেয়া ক্বচিৎ ক্বচিত্তু তৎসংজ্ঞিকা জ্ঞেয়া।
সংখ্যাবস্তুনি যথা সুকরাণ্যুপপাদয়িষ্যতঃ তথা বক্ষ্যে॥"

৩। ১০।১৩।৫।

৪। অথর্ব্ববেদ, ৮।৯।১৭,১৯ দ্রষ্টব্য। প্রসিদ্ধ ছন্দের সংখ্যা কখন কখন তিন (অথর্ব্ববেদ ১৮।৪।১৯, যজুর্ব্বেদ-সংহিতা ১।২৭) অথবা আট (শতপথব্রাহ্মণ ৮।৩।৩।৬)ও ধরা হইত।

ঐ সূক্তটী আবার অথর্ব্ববেদেও[১] পাওয়া যায়। সে স্থলে সপ্তসংজ্ঞার অর্থ ভিন্নরূপ করা হয়—'সপ্তসংখ্যক নদী'। সায়ন ভাষ্য করিয়াছেন,—"সপ্ত…সপ্তসংখ্যকা বা নদ্যঃ ক্ষরন্তি"। কারণ, 'সপ্ত সিন্ধু'র ক্ষরণের কাহিনীও বেদে[২] আছে। ঋগ্বেদের এক স্থলে আছে[৩],—

"ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং"

(অগ্নি) "পবিত্র তিন দ্বারা অর্চ্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছিলেন।" সায়ন বলেন যে, 'পবিত্র তিন' অর্থ 'অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য'। সামবেদে[৪] আছে,—

"অয়ং ত্রিঃসপ্ত দুদুহান"

এখানে 'ত্রিঃসপ্ত' সংখ্যা দ্বারা তৎসংখ্যক গরুকে লক্ষণা করা হইয়াছে। অন্যত্র আছে[৫]—

"ধনত্রয়ো পুরুষান্ত্যো বা সহস্রাণি দদ্মহে"

এ স্থলে 'সহস্র' অর্থ 'সহস্রসংখ্যক ধন'। বাংলার লৌকিক ভাষায়ও উহা প্রচলিত আছে,—'হাজার হাজার দিলাম'।

বস্তুবিশেষের নামকে পারিভাষিক করিয়া সংখ্যা জ্ঞাপনের প্রথাটা প্রথম প্রচলিত হয় ব্রাহ্মণ ও সূত্র-গ্রন্থাদির যুগে; কিন্তু স্থানীয়মানের অবতারণা সহকারে তাহাকে সম্যক্‌রূপে প্রণালীবদ্ধ করা হইয়াছিল আরও বহু কাল পরে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন, সেটা হইয়াছিল কোন্ কালে? 'অর্থশাস্ত্রের' বাক্যবিশেষের ব্যাখ্যা হইতে আমি অনুমান করি যে, খ্রীষ্টসালারম্ভের তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কৌটিল্য স্থানীয়মানতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং নামসংখ্যায় তাহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার সমর্থন করিতে, কৌটিল্যের গ্রন্থ হইতে গণনাবিষয়ক নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, আমি প্রদর্শন করিয়াছি যে, সংখ্যা-লিখনের কোন না কোন প্রকার সহজ ও সরল পদ্ধতি জানা, কৌটিল্যের পক্ষে খুবই সম্ভব। এমন কি, তাহা অপরিহার্য্য। শ্রীযুক্ত রায়ও উহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার উল্লিখিত ব্যাখ্যা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রতিবাদে তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও নিঃসংশয় নহে। 'নান্দী' শব্দের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। বিশাল এই হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশবিশেষের অর্ব্বাচীন কালের গ্রাম্য ভাষায় কোন শব্দবিশেষ দেখিয়া দুই হাজারাধিক বৎসরেরও প্রাচীন কালে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা করা যে কত দূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

কৌটিল্যের সমকালে বা তাহার স্বল্পকাল পরে যে নামসংখ্যা-প্রণালী এ দেশের পণ্ডিতবর্গের প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ কালে লিখিত 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে'র ন্যায় স্বল্পকলেবর গ্রন্থে প্রায় ২০টি সংজ্ঞা ন্যূনাধিক ৫৩ বারব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। উহাতে আরও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। পিঙ্গল লিখিয়াছেন[৬],—

১। ৭।৫৭।২।

২। "সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব॥"—ঋগ্বেদ, ৮।৬৯।১২।

৩। ৩।২৬।৮। ৪। উত্তরার্চ্চিক, ৩।৫।৩। ৫। উত্তরার্চ্চিক, ৭।৩

৬। 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্র', হলায়ুধ ভট্টের টীকা সহ, ১৮৯২ খ্রীষ্ট সালে কলিকাতা হইতে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; ৮।১৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।

"অষ্টৌ বসব ইতি"

অর্থাৎ "বসু" সংখ্যা দ্বারা আট সংখ্যা বুঝিতে হইবে। এতদ্দৃষ্টে মনে হয়, তখনকার পণ্ডিতসমাজে সংখ্যা খ্যাপনের দুই বা ততোধিক প্রণালীবিশেষ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটা নামসংখ্যাপ্রণালী। এই সূত্রে পিঙ্গল সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থে ঐ প্রসিদ্ধ প্রণালীক্রমেই সংখ্যা নির্দ্দেশিত হইবে। টীকাকার হলায়ুধ ভট্টও মনে করেন যে, "লৌকিক প্রসিদ্ধকে লক্ষ্য করিয়াই এই সূত্র করা হইয়াছে[১]।" কিন্তু পিঙ্গলের সময়ে নামসংখ্যা স্থানীয়মান সহ ব্যবহৃত হইত কি না, তাহা এখনো সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় নাই। অন্ততঃ পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রে তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহা হইতে ছিল না সিদ্ধান্ত করাও ঠিক হইবে না। এমন কোন বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে নাই, যাহাকে নামসংখ্যায় প্রকাশ করিতে স্থানীয় মানের আবশ্যক হয়। পিঙ্গল যে স্থানীয়মানতত্ত্ব অবগত ছিলেন, তাহার প্রামাণ আমরা অন্যত্র দিয়াছি[২]। 'ছন্দঃসূত্রে'র "ঋতুসমুদ্রর্ষ্যায়" (৭.১৬), এই বাক্যে আমরা সাধারণতঃ বামা গতিতে ৭৪৬ সংখ্যা বুঝি। কিন্তু পিঙ্গল লিখিয়াছেন, '৬, ৪ ও ৭' বুঝাইতে। এই প্রকার সমাহার দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পিঙ্গলের সময়ে নামসংখ্যা স্থানীয়মান সহ ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু উহা ঠিক হইবে না[৩]।

অগ্নিপুরাণে যে নামসংখ্যার প্রয়োগ আছে, পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অতি সাধারণ রকমে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে (২০ পৃষ্ঠা)। পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে আধুনিক বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে এত মতভেদ আছে যে, তাহাদের উপকরণের প্রমাণে নির্ভর করিয়া নামসংখ্যার পূর্ব্বাপর ইতিহাস সঙ্কলন করিতে আমি সাহস করি নাই। ৪২৭ শককাল ('পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র রচনা-কাল) হইতে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ জ্যোতিষশাস্ত্র হইতেই পাওয়া যায়। উৎপল ভট্টের অনুবাদিত 'মূলপুলিশসিদ্ধান্তে'র শ্লোকটা অভ্রান্ত মানিলে, না মানার কোন সঙ্গত কারণ নাই—আরও দু তিন শত বছরের আগের প্রমাণ হইল। সুতরাং অভাব তাহারও পূর্ব্বেকার ইতিহাসের অকাট্য প্রমাণের। আমার নিজের বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, পুরাণের বচন নামসংখ্যা-প্রণালীর সে কালের ইতিহাসের প্রমাণরূপে নির্ব্বিবাদে আধুনিক বিদ্বৎসমাজে—পাশ্চাত্ত্যভাবে শিক্ষিত সমাজের কথাই বলিতেছি—গৃহীত হইবে কি না, সে সন্দেহ আমার তখনও ছিল, এখনও আছে। যাহা হউক, পুরাণের প্রমাণ সংক্ষেপে এস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল। তাহা অন্ততঃ নামসংখ্যার ইতিহাসের একদিকের প্রমাণ হইবে। অগ্নিপুরাণের[৪] ১২২ ৩, ১৩১, ১৪০-১, ৩২৮-৩৩৫ অধ্যায়ে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে। শেষোক্ত আট অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় ছন্দঃ।

১। "অত্র শাস্ত্রে বসবঃ ইতি উচ্যমানে অষ্টসংখ্যোপলক্ষিতাঃ গুরুলঘুরূপাঃ বর্ণাঃ গৃহ্যন্তে। লৌকিক-প্রসিদ্ধ্যুপলক্ষণার্থম্ ইদং সূত্রম্। তেন চতুর্ণাং সমুদ্রাঃ পঞ্চানাম্ ইন্দ্রিয়াণি ইত্যেবমাদয়ঃ সংজ্ঞাবিশেষাঃ লৌকিকেভ্যঃ।"

২। Bibhutibhusan Datta, "Early literary evidence of the use of the Zero in India," *American Mathematical Monthly*, vol. 33, 1926, pp. 449-454. আরো দ্রষ্টব্য "শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী," ২২-৩ পৃষ্ঠা।

৩। বরাহের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'তে আছে,—"মেষজ্যাঃ স্বরতিথয়ঃ ষণ্ণবিধৃতিভিশ্চ বিংশতিঃ সহিতা" (৪।৬) উহার অর্থ—"মেষের জ্যা—৭, ১৫, ২০ + ৬, ২০ + ১১, ২০ + ১৮।" এই প্রকার সমাহার দেখিয়া বলিতে পারা যায় না যে, বরাহ স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যা ব্যবহার করেন নাই। পিঙ্গলের প্রতিও সেই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

৪। অগ্নিপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৪ সাল।

বস্তুতঃ উহারা পিঙ্গলছন্দঃসূত্রেরই সামান্য ইতরবিশেষ। অপর অধ্যায়গুলি গণিত জ্যোতিষ-বিষয়ক। "ছন্দঃসার" অধ্যায়গুলিতে স্থানীয় মানের পরিচয় নাই। "জ্যোতিঃশাস্ত্রসার" অধ্যায়গুলিতে আছে, যথা,—'খার্ণব'=৪০ 'খরস'=৬০ (১২৩।৩); 'বেদাগ্নি'=৩৪, 'বাণগুণ'=৩৫ (১৪১।১৪) ইত্যাদি। ওখানে কতকগুলি নূতন সংজ্ঞাও দেখা যায়, (২) যথা, মৃত্যু (১২২।১৪), ঋত্বিগ্ (১৩২।৪, ১৪০।৫, ১৪৯।১০), মৈত্র (১২২।৬) এবং পক্ষ (১৪৯।১১), অপর কোন পুরাণে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে কি না, আমার জানা নাই।

পেশোবার সহরের অদূরবর্ত্তী বক্শালী গ্রামে প্রাপ্ত একখানি অতিপ্রাচীন গণিতের পাণ্ডুলিপিতে[১] (বহু অংশে ত্রুটিত) স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ খ্রীষ্ট সালের প্রারম্ভকালে লেখা[২]। অপর পক্ষে রোটাস শিলালিপিতে যোগবিধির নিয়মে নামসংখ্যায় বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়; যথা[৩]—

"নবতিনবমুনিরৈন্দ্রৈর্বাসরাণামধীশৈঃ।
পরিকলয়তি সংখ্যাং বৎসরে সাহশাকে॥"

এ স্থানে, নবতি=৯০, নব=৯, মুনি=৭, ইন্দ্র=১৪, বাসরাণামধীশঃ=সূর্য্য=১২। সুতরাং ৯০+৯+৭+১৪+১২ অর্থাৎ ১৩২ শকে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। কিন্তু এই প্রকার অপর কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না।

নামসংখ্যা-প্রণালীতে সাধারণতঃ বামাগতি অনুসৃত হইয়া থাকে। সেই জন্য একটা বিধিবাক্যও আছে,—"অঙ্কস্য বামাগতিঃ"। কিন্তু উহার কারণ কি, তাহা এখনও সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন যে, "বড় বড় সংখ্যা শুনিয়া লিখিতে হইলে, বামাগতিক্রমে লিখিয়া গেলে অঙ্কের স্থানে ভুল হয় না। নানা সংখ্যা পরে পরে লিখিতে হইলে দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাতে ভুল হইতে পারে। চারি লক্ষ বত্রিশ সহস্র লিখিতে হইলে ৩২এর পরে কয়টা শূন্য বসিবে, তাহা ভাবিতে হয়। কিন্তু শূন্য শূন্য শূন্য দুই তিন চারি, বলিয়া গেলে সংখ্যাটি যে-সে নির্ভুল লিখিয়া দিবে।" ওটাকে ত নামসংখ্যার গুণ বলিতে হয়। চারি তিন দুই শূন্য শূন্য শূন্য বলিলেও তেমন নির্ভুল হইত। কিন্তু প্রশ্ন, তাহা না করিয়া বিপরীতক্রমে বলা হয় কেন? তিনি লিখিয়াছেন যে, সংস্কৃতে 'আদি' স্থানের অঙ্ক প্রথমে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সেই হেতু নামসংখ্যায়ও ঐ রীতি। "সংস্কৃতে ১৪৪২ অঙ্ক পড়িতে হইলে দ্বিচত্বারিংশদধিকচতুর্দ্দশশত বলা হয়। প্রথমে 'আদি' স্থানের অঙ্ক, পরে বামাগতিতে অন্য স্থানের অঙ্ক, অঙ্কস্য বামাগতি। এই দৃষ্টান্তে, যাবতীয় বামাগতি চলিয়া আসিয়া থাকিবে।" (২১৮ পৃষ্ঠা এখানে একটু ভুল আছে। 'অধিক' শব্দ সর্ব্বসময়ে উল্লিখিত হয় না। তখন ১৪৪২কে পড়া হইয়া থাকে—চতুর্দ্দশশতদ্বিচত্বারিংশৎ। এটাই সাধারণ নিয়ম। অন্যত্র[৪] আমরা

১। এই পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে,—G. R. Kaye, *The Bakhshali Manuscript*—A Study in Mediaeval Mathematics—Parts I and II, Calcutta, 1927.

২। R. Hoernle, *Indian Antiquary* xvii (1888), pp. 33—48, 275—9.
Bibhutibhushun Datta, "The Bakhshali Mathematics" *Bull. Cal. Math. Soc.* vol. 21, 1927, pp. 1-60.

৩। "Rohtas rock inscription of the year 182", *Proc. Asiat. Soc. Beng.* June, 1876, p. 111. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট এই শিলালিপির সন্ধান পাইয়াছি। সুতরাং তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

৪। Bibhutibhusan Datta. "The present mode of expressing numbers", *Indian Historical Quarterly*, iii (1927). pp. 530—40.

বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি যে, সংস্কৃত ভাষায়--দুনিয়ার অপরাপর ভাষায়ও— কোন বহু-অঙ্ক-স্থানব্যাপী বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিতে হইলে তৎস্থ ঊর্দ্ধতন অঙ্কস্থানের নাম প্রথমে করিতে হয়। তিন্ন নিম্নতন স্থানব্যাপী অঙ্কের উল্লেখ পর পর ক্রমে হইয়া থাকে। কিন্তু চরমে আসিলে কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় হয়—দশকস্থানের পূর্ব্বে একক স্থানের উল্লেখ হয়। এ দেশের প্রাচীন গাণিতিকেরা—গণেশ, নৃসিংহ প্রভৃতি তাহার একটা যুক্তিও দিয়াছেন। কিন্তু নামসংখ্যা-প্রণালীতে নিম্নতম স্থানবর্ত্তী অঙ্কের নামোল্লেখ প্রথমে করিতে হয় কেন? আমি এই পর্য্যন্ত তাহার কোন সদ্‌যুক্তি নিরূপণ করিতে পারি নাই। প্রাচীন লেখা হইতে এই বিষয়ে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার আলোচনা ভবিষ্যতে করিবার ইচ্ছা আছে। ইতিমধ্যে আরও খুঁজিব ও ভাবিব, কোন আলোর সন্ধান মিলে কি না। নামসংখ্যার প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং তাহাতে দক্ষিণাগতির আবির্ভাবকাল বিষয়ে পূর্ব্বপ্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। পরবর্ত্তী কালে সংগৃহীত উপকরণের বলে উহা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। তাহার জন্ত ভিন্ন প্রবন্ধ লিখিয়াছি এবং অল্পকাল মধ্যে তাহা সাধারণে প্রকাশ করা যাইবে। সুতরাং এ স্থলে ঐ বিষয়ের আলোচনাও করিব না।

শ্রীযুক্ত রায়ের প্রবন্ধের বিশেষত্ব, আমার বিবেচনায়, (১) নামসংখ্যার কোষ সঙ্কলন, (২) প্রতি সংখ্যার প্রয়োগের ইতিহাসবিনির্ণয় এবং সর্ব্বোপরি (৩) তাহার উপপত্তি বিচার ও মর্ম্মরহস্যোদ্ঘাটন। ইহাদের প্রত্যেক বিষয়েই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বপ্রবন্ধ লিখিবার কালে আমি 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্র,' বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' (৪২৭ শককাল) ও 'বৃহজ্জাতক', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' (৫৫০ শককাল), মহাবীরাচার্য্যের 'গণিতসারসংগ্রহ' (প্রায় ৭৭৫), ভাস্করাচার্য্যের 'লীলাবতী' (১০৭২), 'কবিকল্পলতা'[১] (দ্বাদশ, কি ত্রয়োদশ শকশতক) প্রভৃতি হইতে নাম-সংখ্যার নিঘণ্টু সঙ্কলন করিয়াছিলাম। বেদ ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাদি হইতে এবং শিলালেখ প্রভৃতি হইতেও কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করি। খ্রীষ্টীয় সালের চতুর্থ শতক হইতে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত কি কি সংজ্ঞা ও তাহাদের পর্য্যায় শব্দ সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হইত, তাহারও তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। ঐ প্রকার আলোচনার ফলেই নামসংখ্যার প্রাচীনতা এবং তাহাতে পৌরাণিক প্রভাবের ক্ষীণতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার ফল পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমার সংগ্রহ পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া, আমি নামসংখ্যা-কোষ প্রণয়নে কোন চেষ্টা করি নাই। শ্রীযুক্ত রায়ের সঙ্কলিত কোষ খুব সুন্দর হইয়াছে। তবে উহাও সম্পূর্ণ নহে, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করার ভার যিনি গ্রহণ করিবেন—উহা করা খুবই বাঞ্ছনীয়—তাঁহার সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া নামসংখ্যা-নিঘণ্টু সঙ্কলনের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সঙ্কলিত নিঘণ্টুর[২] উল্লেখ শ্রীযুক্ত রায় করিয়াছেন। খুবই সম্ভব যে, পূর্ব্বে এ দেশে আঙ্কিক কোষ ছিল। কিন্তু তেমন কোন প্রাচীন কোষগ্রন্থের

১। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র সহায়ে, সম্পূর্ণ মূল গ্রন্থ দেখি নাই।

২। "সাঙ্কেতিক শব্দ", 'ভারতবর্ষ' ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩২০—২১ বঙ্গাব্দ, ৭২—২১ পৃষ্ঠা।

সন্ধান আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই। যে দু'চারটার কথা শোনা যায়, তাহারাও বোধ হয়, দু'চার শ' বছরের প্রাচীন নহে ।

শব্দসংখ্যা সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা দেখিয়াছি 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে'। উহা বস্তুতই প্রচেষ্টা মাত্র। উহাতে একটার অধিক সংজ্ঞা সংগৃহীত হয় নাই। "অষ্টৌ বসব ইতি" (১। ১৫)। পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের অগ্নিপুরাণোক্ত সংস্করণে উহার কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া তিন সংজ্ঞার আধার হইয়াছে। অগ্নিপুরাণ বলে[১]—

"বসবোঽষ্টৌ বিজ্ঞেয়া বেদাদিত্যাদিলোকতঃ।"

অর্থাৎ " 'বসু' (সংজ্ঞা) দ্বারা 'আট' বুঝিবে ; 'বেদ', 'আদিত্য' প্রভৃতি দ্বারাও সেইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি অনুযায়ী (সংখ্যা) বুঝিবে।" অগ্নিপুরাণে সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ আরও কতিপয় সংজ্ঞার প্রয়োগ আছে। কিন্তু সেগুলির সংগ্রহ উহার কুত্রাপি নাই। অতঃপর 'সংখ্যা-সংজ্ঞা'র সংগ্রহ দেখা যায় (প্রায় ৭৭৫ শককালে) মহাবীরাচার্য্যের 'গণিতসারসংগ্রহে'।[২] উহাতে ১ হইতে ৯ এবং ০ সংখ্যার কতিপয় সংজ্ঞা সঙ্কলিত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫টা শব্দ আছে। কিন্তু উহাও অপূর্ণ। ঐ নিঘণ্টুর অতিরিক্ত সংজ্ঞা 'গণিতসারসংগ্রহে'ই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ উহাতে দশ বা ততোধিক কোন সংখ্যার সংজ্ঞা নাই। অথচ মহাবীর ঐ প্রকার সংজ্ঞার ব্যবহার করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পার্শী পর্য্যটক অলবিরূণী তাঁহার 'ভারত-বিবরণ' গ্রন্থে নামসংখ্যার একটা নিঘণ্টু দিয়াছেন।[৩] উহাতে ন্যূনাধিক ১১৪ শব্দ আছে। উহাতে পৌরাণিক প্রভাবযুক্ত এবং অন্য উপায়ে প্রাপ্ত কতিপয় সংজ্ঞাও দেখা যায়। যথা,—রবিচন্দ্র (=২), ত্রিকটু (=৩), পাণ্ডব (=৫), রাবণশির (=১০), অক্ষৌহিণী (=১১) ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে, ঐ যুগে নামসংখ্যায় বেদব্যতিরিক্ত প্রভাবের ছায়া পড়িয়াছে। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, ঐ সময়ের অনতিকাল পূর্ব্ব হইতে ঐ ছায়াপাতের আরম্ভ। অলবিরূণী লিখিয়াছেন, "আমি হিন্দুদিগের সম্পর্কে যতটা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাঁহারা সাধারণতঃ পঁচিশের ঊর্দ্ধতন সংখ্যা এই পদ্ধতিতে জ্ঞাপন করেন না।"[৪]

ইহার পরের সংগ্রহ পাওয়া যায় বাগ্‌ভটের অলঙ্কারশাস্ত্রে। এই গ্রন্থ আমি দেখি নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে উহা নাই। জনৈক বন্ধু[৫] তাঁহার গ্রন্থবিশেষের ভূমিকায় নামসংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট উহার রচনা-কালের বিচার-প্রসঙ্গে 'বাগ্‌ভটালঙ্কার' হইতে কয়েকটি কথা অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে বোঝা যায় যে, বাগ্‌ভট নামসংখ্যা-নিঘণ্টু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আলঙ্কারিক বাগ্‌ভট দুইজন। তাঁহাদের একজন অপরের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। অগ্নিপুরাণ, ৩২৮।৩।

২। ১।৫২—৬২।

৩। এই গ্রন্থের আরবী মূল (*Edward Sachau*, *Alberuni's India*, London, 1887) and ইংরাজী ভাষান্তর (দুই খণ্ডে) টিপ্পনী সহ (Edward C. Sachau, *Alberuni's India*, London, 1888, 2nd edition, 1910) উভয়ই পাওয়া যায়। আমরা ইংরাজী ভাষান্তরের দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ করিতেছি ; ১ম খণ্ড, ১৭৮—৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

৫। বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরালাল রসিকদাস কাপাডিয়া। তাঁহার গ্রন্থের মুদ্রণ এখনো শেষ হয় নাই।

আমরা প্রথম বাগ্‌ভটের অলঙ্কারশাস্ত্রের কথা বলিতেছি। তিনি শক একাদশ শতকের পূর্ব্বার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'-প্রণেতা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বাগ্‌ভট হইতেও ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। 'কবিকল্পলতা' ইহার দু'এক শ' বছরের পরের গ্রন্থ। উহাতে প্রদত্ত নিঘণ্টু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

মান্দ্রাজ সরকারের পাণ্ডুলিপি আগারে 'অঙ্কনিঘণ্টু'র সাতটা পাণ্ডুলিপি আছে।[১] তাহাদের কোন কোনটাতে 'স্থাননিঘণ্টু'ও আছে। 'বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি'র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য বলিলেন যে, তাঁহাদের পুস্তকাগারেও 'সংখ্যাভিধানম্'এর একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। আউফ্‌-রেখ্‌ট্‌-এর[২] সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি তালিকাতে স্বামী রামানন্দ তীর্থ-প্রণীত 'অঙ্কসংজ্ঞা' নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ কোন্ কালের, জানা নাই। বোম্বাই নগরীতে মুদ্রিত 'অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু' দুইখানা দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই।

আধুনিক কালে নামসংখ্যা-নিঘণ্টু সঙ্কলনের প্রথম চেষ্টা করেন, যত দূর জানা গিয়াছে, শ্লেগেল। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপকের দ্বারা একখানি নিঘণ্টু প্রস্তুত করাইয়া প্রাচ্যভাষাবিষয়ক তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন। উহা মুখ্যতঃ 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' অবলম্বনে সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ দৃষ্টান্তে তিব্বতীয় পর্য্যটক কোমা ডি কুরুস বিখ্যাত তাঞ্জুর গ্রন্থ অবলম্বনে তিব্বতী ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার একখানি নিঘণ্টু সঙ্কলন করেন।[৩] অপর দিকে রাফেল যবদ্বীপের ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার সংগ্রহ করেন।[৪] ১৮৩৫ খ্রীষ্ট সালে এই তিনটা নিঘণ্টু একখানি ফরাসী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়।[৫] অনুবাদকর্ত্তা জাকে তৎসঙ্গে সংস্কৃত হইতে আরও কতিপয় নূতন সংজ্ঞা সংগ্রহ করিয়া দেন। আমি এই সংগ্রহ দেখিয়াছি। নামসংখ্যা-প্রণালী হিন্দুস্থান হইতেই যবদ্বীপে ও তিব্বতে নীত হয়। সেই হেতু তত্তৎদেশে প্রচলিত অধিকাংশ সংজ্ঞা সংস্কৃতের প্রতিশব্দ মাত্র। কিন্তু উভয় দেশেরই প্রাচীন বিদ্বন্মণ্ডলী দুই চারিটা নূতন নূতন সংজ্ঞাও সৃষ্টি করিয়াছেন, দেখা যায়। ঐগুলির ব্যবহার মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। যথা তিব্বতী ভাষায়,—গণ্ডক=১, অগ্র=৩, মূল=৯ ইত্যাদি। যবদ্বীপের ভাষায়—১=জনম, বাক্, নাভি, সুত, ইত্যাদি। তিব্বতে গ্রহ (=৯) ও মুখ্য গ্রহ (=৭) দুইটা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। দিক্ সংজ্ঞা হিন্দুস্থানে ১০, যাবায় ৪ এবং তিব্বতে ৬ কি ১০ সংখ্যা জ্ঞাপন করে। তিব্বতী প্রতিশব্দ দুইটার রূপ ভিন্ন। অলবিরুণীর তালিকা দৃষ্টে মনে হয়, হিন্দুস্থানে দিক্=৪, প্রয়োগও ছিল। যাহা হউক, এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কি যবদ্বীপের, কি তিব্বতের, কোন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী নূতন সংজ্ঞা

১। *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscript Library, Madras, Vol. XXIV—Jyautisa*; Mss. No. 13565, 13567, 13601—3, 13792, 14018.

২। T. Aufrecht, *Catalogus Catalogorum*, Leipzig, 1891.

৩। Vide *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol, 7, Part 2, 1838, p. 147 f; reprinted. *Ibid*, vol. 7, New Serics, 1917, Extra Number, p. 35—9.

৪। S. Raffles, *History of Java*, vol. II, App. E.

৫। E. Jaquet, "Mode d'expression symbolique des nombres employe' par les Indiens, les Tibetains, et les Javanais", *Nouveau Journal Asiatique*; t. XVI, (1835), pp. 16—23, 26—35, 40—, 95—116.

চয়নে হিন্দুমনোভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। ঐগুলিও বস্তুতঃ সংস্কৃতসাহিত্য হইতেই চয়িত। ফন্ হুম্বোল্ট্[১] ও তাঁহার এক গ্রন্থে যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার নিঘণ্টু দেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঔপ্‌কে[২] প্রতীচ্য ভূভাগে হিন্দু সংখ্যালিখন-প্রণালীর প্রসার ও প্রতিপত্তিবিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধে অল্‌বিরূণীর সংগৃহীত নিঘণ্টু পুনঃ প্রকাশ করেন। তখনও অল্‌বিরূণীর সমগ্র গ্রন্থের বা তাহার ইংরাজী ভাষান্তরের প্রকাশ হয় নাই। ব্রাউনও[৩] সংস্কৃত নামসংখ্যার একখানি নূতন নিঘণ্টু সঙ্কলন করেন। উহাতে ভুল আছে। ১৮৭৫ সালে বার্ণেল,[৪] মুখ্যতঃ অল্‌বিরূণীর ও ব্রাউনের সংগৃহীত নিঘণ্টু অবলম্বনে একখানি নূতন নিঘণ্টু প্রকাশ করেন। শিলালিপি হইতে কতিপয় নূতন সংজ্ঞাও তিনি সংগ্রহ করিয়া দেন। বার্ণেল মনে করেন যে, অলবিরূণীর তালিকা অভ্রান্ত; সুতরাং উহার সম্বন্ধে কোন প্রকারের সংশয় হইতে পারে না। আমরা তাহা মানিতে পারি না। অল্‌বিরূণী 'উর্বী' (=১)কে লিখিয়াছেন 'উর্বিরা,' 'সিতরশ্মি' (=১)কে লিখিয়াছেন 'রশ্মি', 'উদধি' (=৪)কে লিখিয়াছেন 'দধি'। এইগুলি লেখকদোষও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার 'সীতা'=১, 'ধী'=৮, 'পবন'=৯ সংজ্ঞার উপপত্তি হয় না।

অতঃপর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যূলার নামসংখ্যার একখানি নিঘণ্টু প্রকাশ করেন।[৫] উহার সঙ্কলনে তিনি পিঙ্গলছন্দঃসূত্র, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, অলবিরূণী ও বার্ণেলের তালিকার সাহায্য গ্রহণ করেন। ব্যূলারের নিঘণ্টুর তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ তিনি কোন্ সংজ্ঞা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বার্ণেলের তালিকায়ও উহা আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়। তবে তাঁহার মূল সর্ব্বতোভাবে গৌণ। দ্বিতীয়তঃ সংখ্যাবিশেষের জন্য প্রযুক্ত সংজ্ঞা-সমূহের মধ্যে কোনগুলি মূলতঃ (উৎপত্তির দিক্ দিয়া) ভিন্ন, পর্য্যায় শব্দ সহ তাহাদিগকে শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার ফলে সংজ্ঞাবিশেষের সমস্ত পর্য্যায় শব্দ তাঁহাকে উল্লেখ করিতে হয় নাই, 'প্রভৃতি' বলিয়া তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যটা পুরোগামী কোন সংগ্রহে নাই। ব্যূলারের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—উপপত্তি নিরূপণ। অল্‌বিরূণী লিখিয়াছেন[৬], "ব্রহ্মগুপ্ত বলেন,—যদি এক সংখ্যা লিখিতে চাও, সমস্ত একাত্মক বস্তুর উল্লেখ দ্বারা তাহাকে খ্যাপন কর; যথা,—ভূ, চন্দ্র; দুই (খ্যাপন কর) প্রত্যেক দ্ব্যাত্মক বস্তু দ্বারা, যথা—শ্বেতকৃষ্ণ; তিন (খ্যাপন কর) প্রতি ত্র্যাত্মক বস্তু দ্বারা। আকাশ দ্বারা শূন্য, সূর্য্য দ্বারা দ্বাদশ (জ্ঞাপন কর)।" এই কথাটা বস্তুতঃ ব্রহ্মগুপ্তের নহে। তাঁহার কোন গ্রন্থে উহা পাওয়া যায় না। শ্বেতকৃষ্ণ সংজ্ঞাও তিনি ব্যবহার করেন নাই। উহা হয় ত কোন টীকাকারের। অথবা অল্‌বিরূণী তাঁহার অধ্যাপক পণ্ডিতের মুখে উহা শুনিয়া থাকিবেন।

১। W. v. Humboldt, *Kawi-sprache*, Vol. 1, pp. 19—42.

২। F. Woepcke, "Memoire sur la propagation des chiffres indiens," *Journal Asiatique*, Ser. 6, tome 1, 1363, pp. 284—290.

৩। C. P. Brown, *Cyclic Tables*.

৪। A. C. Burnell, *Elements of South-Indian Palæography*, Mangalore, 1874 pp. 57-9.

৫। J. G. Bühler, *Indische Palæographie*, 1896. English translation by J. F. Fleet, Bombay, 1904, $ 35.

৬। *Alberuni's India*, vol. i, p. 177.

পরে তিনি উহাকে ব্রহ্মগুপ্তের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। একের কথা অপরের মুখে বসাইয়া দেওয়ার ভুল অল্‌বিরূণী আরও করিয়াছেন, দেখা যায়। আমি অন্যত্র তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।[১] কিন্তু কথাটা মূলে যাহারই হউক না কেন, উহাতে যে সংখ্যাসংজ্ঞার উৎপত্তির একটা মূলতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। জেকে কোন কোন সংজ্ঞার, মোট অল্প কয়েকটির, উপপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যূলার অনেক সংজ্ঞার উপপত্তি দিয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহার নিঘণ্টু খুবই মূল্যবান্। কিন্তু উহাও সম্পূর্ণ নহে, নির্দ্দোষও নহে;—তাহাতে দুই চারিটা ভুল আছে। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা-প্রণীত 'ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা' গ্রন্থে নামসংখ্যার এক তালিকা আছে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু শ্রীযুক্ত ওঝা ব্যূলারের প্রদর্শিত সুন্দর পন্থাটা অনুসরণ করেন নাই। মহাবীরাচার্য্যের 'গণিতসারসংগ্রহে'র সম্পাদক রঙ্গাচার্য্য পুস্তকশেষে যে নিঘণ্টু দিয়াছেন, তাহাতে প্রতি সংজ্ঞার উৎপত্তি নির্দ্দেশ আছে।[২] শ্রীযুক্ত রায়ের প্রণীত নিঘণ্টু সব দিক্ দিয়াই পুরোগামী সমস্ত নিঘণ্টু হইতে শ্রেষ্ঠ।

নামসংখ্যার প্রয়োগেতিহাস সংগ্রহ করা অতি দুরূহ কাজ। তাহাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। বস্তুতঃ উহা একজনের পরিশ্রমে হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই হেতু শ্রীযুক্ত রায়ের সংগৃহীত ইতিহাসে যে কিছু ভুল আছে, তাহা আশ্চর্য্য মনে করি না। তাঁহার কোন কোন ভুল এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত রায় মনে করিয়াছেন যে, 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র কালে (৪২৭ শক) ভ=২৭ ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। অন্যত্র তিনি আরও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ঐ সংজ্ঞাটা দশম শতাব্দীর পরকালের। তাঁহার ঐ ধারণা সত্য নহে। আমার প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে (১৫—৬ পৃষ্ঠা), খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতকের ও প্রাচীন কালের 'বেদাঙ্গজ্যোতিষে' এবং খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ঐ প্রকার ব্যবহারের প্রমাণ আছে। এ স্থলে আরও স্পষ্টতঃ উহাদের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছি। 'বেদাঙ্গজ্যোতিষে' আছে,—"বিভজ্য ভসমূহেন"[৩], এ স্থলে 'ভসমূহ'=২৭; "শ্রবিষ্ঠাভ্যো গণাভ্যস্তান"[৪], গণ=ভগণ=২৭। 'অর্থশাস্ত্রে'[৫] পাই নক্ষত্র=২৭। 'ভসমূহ' ও 'ভগণের' পরিবর্ত্তে মাত্র 'ভ' বলিলে দোষ নাই। ৫৫০ শককালের 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' (১৬।৩০) এবং ৫৮৭ শককালের 'খণ্ডখাদ্যকে' (৩।৫) স্পষ্টতই আছে, ভ=২৭।

শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, যুগ=৪, অঙ্গ=৬, তর্ক=৬, মঙ্গল=৮, গ্রহ=৯, প্রভৃতি প্রয়োগ দশম শকশতকের পরবর্ত্তী। তাঁহার লেখা দৃষ্টে মনে হইবে যে, বেদ=৪, বরাহমিহিরের সময়ে প্রচলিত হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। এ সকল কথা ঠিক নহে।

বেদ=৪, পাওয়া যায়—'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে' (৮।১০) এবং 'অগ্নিপুরাণে' (১২২।৪,১৫,১৬ ইত্যাদি)।

১। Bibhutibhusan Datta, "Two Aryabhatas of Albirūni", *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. 17, 1926, pp. 59-74.

২। *Ganita-sara-samgraha*, Appendix I.

৩। যাজুষজ্যোতিষ, ২৭ শ্লোক; আর্চজ্যোতিষ, ৩১। উভয় গ্রন্থই সুধাকর দ্বিবেদীর সম্পাদনায় কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। আর্চ, ১।

৫। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শ্রীশ্যামশাস্ত্রী সম্পাদিত, ৭৮ পৃষ্ঠা।

যুগ = ৩, ব্যবহার—'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' ও 'গণিতসারসংগ্রহে' (২।৩২) আছে।

অঙ্গ = ৬, পাওয়া যায়—'মহাভাস্করীয়ে' (৭।৬, ২৩, ২৪), 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' (ধ্যান-গ্রহোপদেশাধ্যায়, ২৬, ২৮); 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদতন্ত্রে'; 'গণিতসারসংগ্রহে' ও অল্‌বিরূণীর তালিকায়।

তর্ক = ৬, 'গণিতসারসংগ্রহে' আছে।

মঙ্গল = ৮, পাওয়া যায়—অল্‌বিরূণীর তালিকায় এবং প্রাচীন চম্পারাজ্যে প্রাপ্ত শিলা-লিপিতে,[১] যথা,—শককাল "শশিরূপমঙ্গল" = ৮১১ (৩২ নং শিলালিপি), "গগনদ্বিমঙ্গল" = ৮২০ (৩৯ নং), ইত্যাদি[২]। অবশ্য এইগুলি শ্রীযুক্ত রায়ের মতে "আঙ্কিক সংজ্ঞা" নহে, "কবি-সাঙ্কেতিক" মাত্র।

গ্রহ = ৯, ব্যবহার আছে—'গণিতসারসংগ্রহে' (১।৬১) ও 'অগ্নিপুরাণে' (১৩১।৪, ১৪০।৪, ইত্যাদি)। শ্রীযুক্ত রায় অনুমান করেন, এই সংজ্ঞা কবিভাষায় প্রথম আসিয়াছিল, পরে জ্যোতিষগ্রন্থে প্রবেশ করে। এ স্থলে প্রদত্ত প্রমাণে নিশ্চিত হইবে যে, ঐ অনুমান বাস্তবিক নহে।

অঙ্ক সংজ্ঞা শ্রীযুক্ত রায় 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় পান নাই। কিন্তু উহা অষ্টাদশ অধ্যায়ের, ৩৫ শ্লোকে আছে। ঐ সংজ্ঞাটি আরও কত প্রাচীন, তাহাও যথাসম্ভব নিরূপিত হওয়া উচিত। উহার সঙ্গে হিন্দুগণিতের ইতিহাসের একাংশের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। তাহা প্রথম প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। অঙ্ক সংজ্ঞার আবির্ভাবকাল নির্দ্ধারিত হইলে হিন্দু দশমিক সংখ্যা-প্রণালীর আবিষ্কারকালের অধস্তন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত রায় 'গণিতসার-সংগ্রহে' হরিনেত্র (= ৩) সংজ্ঞা পাইয়াছেন। আমরা পাই নাই। নেত্র = ৩, ব্যবহারের দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দশ শকশতকের পূর্ব্বে তিনি পান নাই। চম্পালিপিতে আছে—শককাল "বিবর-হরাক্ষাদ্রি" = ৭৩৯ (২৬ নং), "পক্ষপশুপতিনয়নমঙ্গল" = ৮৩২ (৪০ নং ; আরও দ্রষ্টব্য ৪১ নম্বর)। 'গণিতসারসংগ্রহে' আছে হরনেত্র = ৩। উহা হইতে কালক্রমে নেত্র = ৩, ব্যবহার হইল। শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, "ভূতসংজ্ঞা বরাহে পাই, পরে গণিতশাস্ত্রে চলে নাই। বোধ হয়, পঞ্চশর পর্য্যায় পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল" (২৩০পৃষ্ঠা)। এই কারণেই কি তাঁহার কোনও কোষে ঐ সংজ্ঞার উল্লেখ নাই? যাহা হউক, ভূত = ৫, প্রয়োগ বরাহমিহিরের বহু পূর্ব্বে 'পিঙ্গলছন্দঃ-সূত্র' (৭.৩০, ৮।১১) এবং পরবর্ত্তী কালের 'গণিতসারসংগ্রহে'ও আছে।

শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, "বরাহ ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের অতিরিক্ত সংজ্ঞা ব্রহ্মগুপ্তে নাই। ভাস্করাচার্য্য দেখা হইল না; বোধ হয়, তাহাতেও নূতন সংজ্ঞা নাই।" (২২৩ পৃষ্ঠা)। প্রায় ঐ প্রকার মোটামুটি একটা কথা প্রথম প্রবন্ধে আমিও বলিয়াছি, "যদিও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা বরাহের ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন পর্য্যায় শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন, নব নব তত্ত্বের বিচার দ্বারা বা অপর যুক্তিযুক্ত উপায়ে নূতন শব্দসংখ্যার উদ্ভাবনায় কোন চেষ্টা করেন নাই।

১। R. C. Mazumdar, *Ancient Indian Colonies in the Far East, vol. 1, Champa* Lahore, 1927. এই গ্রন্থে প্রদত্ত নম্বর অনুসারে শিলালিপি নির্দ্দেশিত হইল।

২। আরো দ্রষ্টব্য ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪ নম্বর-শিলালিপি।

...সুতরাং মূল বিষয় এক রকম পরিবর্ত্তনহীন অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে" (১৯ পৃষ্ঠা)। খ্রীষ্টীয় সালের দশম শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষ-গ্রন্থকারদিগের কথাই তখন আমার মনে ছিল। সে যাহাই হউক, ঐ প্রকার মন্তব্য একেবারে নিঃসত্ত্ব না হইলেও, সর্ব্বাংশে বাস্তবিক নহে। সুতরাং দোষ বেশী কম, উভয়েরই আছে। কারণ, বরাহের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'তে নাই, এমন কতিপয় সংজ্ঞা ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' আছে। তাহাদের সংখ্যা অল্প বটে, তবুও আছে। যেমন,—অঙ্গ=৬ (ধ্যান ২৬, ২৮), অতিধৃতি=১৯ (২।৮, ১৯ ইত্যাদি), গজ=৮ (ধ্যান ২৬, ৪৯, ৫১, ৫৪), গো=৯ (১।১৮, ২৬), চক্রাংশ=৩৬০ (২।৪৯, ৫২), তত্ত্ব=২৫ (১০।২, ধ্যান ৩৭), ভ=২৭ (১৬।৩০), ভাংশ=৩৬০ (২।১৪, ১৫) ভুজঙ্গ=৮ (ধ্যান ৫১, ৫২), শক=১১ (ধ্যান ৫১)। ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যকে' আর একটা নূতন সংজ্ঞা আছে,—তান=৪৯ (১।১০)। প্রচলিত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে' ব্যবহৃত নামসংখ্যার নিঘণ্টু আমার নাই। শ্রীযুক্ত রায়ের নিঘণ্টু হইতে দেখি যে, অঙ্গ, চক্রাংশ, তান, ভাংশ ও শক ব্যতিরিক্ত অপর সমস্ত সংজ্ঞা তাহাতে আছে। আবার দুই চারিটা এমন সংজ্ঞা আছে, যাহা 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় পাওয়া যায়, কিন্তু 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' নাই। যেমন,—অঙ্ঘ্রি=৪ (১।১৮), অতিষ্বাদশ=১৩ (৪।৯), ইন্দ্র=১৪ (৯।১৬), উৎকৃতি=২৬, নরক=৯ (৪।৬), ভূপ=১৬ (৪।১০) ও স্বর্গতি=৯ (২।৮)। এতন্মধ্যে ইন্দ্র সংজ্ঞা ব্যতীত অপরগুলি প্রচলিত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে' নাই।

ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থ না দেখিয়া, তাহাতে নূতন কোন সংজ্ঞা আছে, কি নাই, অনুমান করা শ্রীযুক্ত রায়ের পক্ষে ঠিক হয় নাই। তাঁহার অনুমান কতটা ভুল, তাহা আমিও এখন দেখাইতে পারি না, স্বীকার করি। কারণ, ভাস্করের সমস্ত গ্রন্থ হইতে সংখ্যাসংজ্ঞার নিঘণ্টু আমি পূর্ব্বে সঙ্কলন করি নাই। তবে এই প্রমাণ জানি যে, 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' ও 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে' নাই, এমন সংজ্ঞা ভাস্করাচার্য্য ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার 'লীলাবতী'তে পাওয়া যায়,—যুগ=৪, ভ=২৭; 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র 'মধ্যমাধিকারে' আছে, অঙ্গ=৬, আকৃতি=২২, ক্রম=৩, গর্ভ=১১, যুগ=৪ এবং 'স্পষ্টাধিকারে' আছে, পূর্ণ=০, ভাংশ=৩৬০, প্রভৃতি। গর্ভ সংজ্ঞা আমি অপর কুত্রাপি দেখি নাই। শ্রীযুক্ত রায়ের সংগ্রহেও নাই, উহার উপপত্তি কি? তিনি পূর্ণ সংজ্ঞা 'সিদ্ধান্তদর্পণে' পাইয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য উহার বহুল উপযোগ করিয়াছেন। মুনীশ্বর বলেন যে, ত্রিসংখ্যক বামনচরণ হইতে ক্রম সংজ্ঞার উপপত্তি।[১] 'মহাভাস্করীয়ে' (৭।৫, ১১) আছে, বিষ্ণুক্রম=৩।

শ্রীযুক্ত রায় সংখ্যাসংজ্ঞাগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—গণিতে ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও কবিসাঙ্কেতিক ভাষায় প্রযুক্ত সংজ্ঞা। এটা তিনি খুবই ভাল করিয়াছেন। বরাহের 'বৃহজ্জাতকে' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় ব্যবহৃত সংখ্যাসংজ্ঞায় যে ভেদ আছে, তাহা প্রথম প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ প্রকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিয়া কোন শ্রেণীর লোকের কোন সংজ্ঞার কি অর্থ গ্রহণ করা উচিত, তাহা সহজে বোঝা যাইবে। সেই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত রায় সংখ্যাসংজ্ঞার দুইখানা পৃথক্ কোষ লিখিয়াছেন,—"আঙ্কিক শব্দকোষ" ও "কবি

১। সিদ্ধান্তশিরোমণি, মধ্যমাধিকার, ভগণাধ্যায় (মরীচি)।

সাঙ্কেতিক শব্দকোষ।" শেষেরটাতে অপরটার অতিরিক্ত সংজ্ঞাগুলি স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞা বিশ্লেষণে ভুল আছে। যেহেতু, তিনি এই সংজ্ঞাগুলিকে গণিতে প্রযুক্ত হয় না মনে করেন,—অঙ্গ (=৬), কাল (=৩,৬), কোশ (=৬), গতি (=৪), দ্বীপ (=৭), পুর (=৩), প্রাণ (=৫), ভুবন (=৩,৭, ১৪), মাতৃকা (=১৬), মাস (=১২), রত্ন (=৯), লব্ধক (=৯), লোক (=৩১, ১৪), বর্ণ (=৪), বায়ু (=৭)। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন যে, "'পুর' আঙ্কিক নয়, যদিও কবিভাষায় কখন কখনও তিন বুঝাইত।" (প্রবাসী, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)। ঐ সকল সংজ্ঞার মধ্যে কাল, কোশ, প্রাণ, মাস ও বায়ু ব্যতীত অপরগুলি 'গণিতসারসংগ্রহে' প্রদত্ত নিঘণ্টুতে পাওয়া যায়। তবে তথায় তাহাদের কোন কোনও সংজ্ঞার পারিভাষিকত্বে কথঞ্চিৎ ভেদ আছে। যেমন মহাবীরের মতে ভুবন=৩; মাতৃকা=৭; লোক=৩; রত্ন=৩,৯ এবং বর্ণ=৬। তথায় 'লব্ধকে'র পরিবর্ত্তে 'লব্ধ' ও 'লব্ধি' আছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অঙ্গ সংজ্ঞা 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে,' 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ তন্ত্রে' ও 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে আছে। লোক=৩, ব্যবহার 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র (১২৮) উপর পৃথূদক স্বামীর (৭৬৬ শককাল) কৃত টীকায় ও অলবিরূণীর তালিকায় আছে। মাস ও কোশ সংজ্ঞার গণিতে প্রয়োগ আমিও এই পর্য্যন্ত পাই নাই। প্রাণ এবং বায়ু সংজ্ঞাও বস্তুত আঙ্কিক (পরে দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, এই বিভাগ আরো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত রায় মনে করেন যে, মাস ও কোশ সংজ্ঞা পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শেষোক্ত সংজ্ঞাটি নাকি শকদ্বাদশ শতকের। মাস=১২, 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে' (৭।১২) আছে। অলবিরূণীর তালিকায় পাওয়া যায়, মাস=১২, মাসার্দ্ধ=৬। ঋগ্বেদে যে বৎসরকে কখন কখনও 'দ্বাদশ' বলা হইত, তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে কথিত হইয়াছে। 'জৈমিনী ব্রাহ্মণে'ও সেই প্রয়োগ দেখা যায়,—"দ্বাদশস্য মাসা......" (৩।৬৮)। তাহার কারণ, বর্ষ দ্বাদশমাসাত্মক। সুতরাং বিপরীত ক্রমে মাস=১২, ব্যবহার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সংজ্ঞাটি আরো সাধারণভাবে নামসংখ্যায় ব্যবহৃত হয় না কেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কোশ=৬, ব্যবহার চম্পালিপিতে আছে; যথা—"কোশখভূধর"=১০৬ ও "কোশনবর্ত্ত"=৬৯৬ (২২ নং), "কোশাগমুনি"=৭৭৬ শককাল (৩০ নং)।

প্রথম প্রবন্ধে কতিপয় সংজ্ঞার উপপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, "তাহাদের ও অপরাপরগুলির বিশদ ও পূর্ণ আলোচনা বিজ্ঞতর ব্যক্তির শক্তিসাপেক্ষ।" তবুও ধৃষ্টতা করিতে গিয়া ভুল করিয়াছিলাম। আমার সেই আলোচনার একটা উদ্দেশ্য ছিল, পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করা। তাহা সফল হইয়াছে এবং তাহাতেই আমার আনন্দ। শ্রীযুক্ত রায় খুব কৃতিত্বের সহিত ঐ আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। অক্ষ=৫, ব্যবহারের উপপত্তি বৈদিক অক্ষক্রীড়া হইতে মনে করিয়া, উহার আলোচনায় কতকটা কল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় সত্যই বলিয়াছেন যে, উহাতে আমি "দূরবিভ্রষ্ট" হইয়াছি। আমিও পরে, তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের আগে, বুঝিয়াছিলাম যে, অক্ষ=ইন্দ্রিয়=৫, বলিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, আমার প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি ঐ সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর অক্ষক্রীড়ার "চমৎকার ইতিহাস......উদ্ঘাটন" করিয়াছেন। উহা তাঁহার মত পণ্ডিতের

পক্ষেই সম্ভব। মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র রচনাকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে মতবিরোধ আছে। মাণিক গাঙ্গুলী নিজেই স্বীয় গ্রন্থের রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু নামসংখ্যায় ও রহস্যপূর্ণ করিয়া। মুখ্যতঃ নামসংখ্যার ঐ রহস্যভেদ করিতে গিয়াই মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবলমাত্র নামসংখ্যার ইতিহাসের খাতিরে, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলাম যে, ঐ স্থলে সিদ্ধ=৮, ও যোগ=৮, মনে করা যাইতে পারে। এবং কি প্রকারে এই দুইটি সংজ্ঞার উপপত্তি করা যাইতে পারে, তাহারও প্রকট ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রায় উহাকে "অপব্যাখ্যা" মনে করেন। তাহার প্রতিবাদ ও খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"সিদ্ধি=৮, স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইতে সিদ্ধ=৮ অভ্যুপগম স্বীকার করিলে আঙ্কিক শব্দের পারিভাষিকত্ব লুপ্ত হয়। যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া যোগ=৮, ধরিলে আঙ্কিক শব্দের মূলোচ্ছেদ হয়। দেহ নবদ্বার; তা বলিয়া দেহ=৯ হইতে পারে না।"[১] আমি এই মন্তব্যের সার্থকতা দেখি না। নামসংখ্যা-প্রণালীতে সাধারণত যোগ=৮, সিদ্ধ=৮, ব্যবহার পাওয়া যায় না, জানি।[২] কিন্তু অসাধারণ উপলক্ষের কথাই বলিতেছিলাম। আমার লেখায় তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। অসাধারণ কালে অসাধারণ কারণে অসাধারণ ব্যাখ্যা করিতে হয় না কি?[৩] ব্রাহ্মণগ্রন্থাদিতে এবং পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থেও বৈদিক ছন্দের নামগুলি সংখ্যা-সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যথা,—গায়ত্রী=৮,২৫; জগতী=১২,১৮; বিরাট্=৫,১০, ইত্যাদি। ঐ সকল সংজ্ঞার উপপত্তি সমগ্র ছন্দের বা তাহার পাদবিশেষের অক্ষর-সংখ্যা হইতে, সকলেই ইহা জানেন। শ্রীযুক্ত রায়ও স্বীকার করেন যে, সংখ্যা-সংজ্ঞার একবিধ মূল তত্ত্ব এই,—"কোন পদার্থের যত ভাগ আছে, সে পদার্থের নাম দ্বারা তত সংখ্যা বুঝায়।" (২২৬ পৃষ্ঠা)। সুতরাং যোগ=৮, ধরিলে দোষ কি? মহাবীরাচার্য্যের মতে তনু=৮, লব্ধি ও লব্ধ=৯। তনু (ও কায়) সংজ্ঞা চম্পালিপিতেও পাওয়া যায়।[৪] শিবের তনু অষ্টোপাদানে গঠিত।[৫] তাই তনু=৮। জৈন মতে লব্ধব্য বস্তু নয়টা।[৬] তাই লব্ধি, লব্ধ=৯। সেই প্রকারে বলা যায় না কি, সিদ্ধ=৮, যোগ=৮? শঙ্কু সাধারণত বার আঙ্গুল পরিমিত হইয়া থাকে বলিয়া বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত[৭] সংজ্ঞা করিয়াছেন, শঙ্কু=১২। মুনীশ্বর লিখিয়াছেন যে, "কৃতযুগে ধর্ম্মের চারি পাদ ছিল বলিয়া

১। 'প্রবাসী', ১৩৩৬, পৌষ, ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

২। অসমিয়া ভাষায় কাকিনাথ-প্রণীত 'ধীরমোহিনী অঙ্কার্য্যা' নামে একখানি প্রায় ১১০ বছরের প্রাচীন গণিত গ্রন্থ আছে। তাহাতে দেখা যায়, সিদ্ধ=৪ ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩২৯, ১ পৃষ্ঠা)।

৩। 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র রচনাকাল নিরূপণে সেইরূপ অসাধারণ কারণ ঘটিয়াছিল কি না, তাহা গণিতৈতিহাসিক অপেক্ষা সাহিত্যৈতিহাসিকেরই অধিক বিবেচ্য। অবশ্য গণিতৈতিহাসিক তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করিবেন না। স্বীয় শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যথাসম্ভব তাঁহার সহায় হইবেন।

৪। ৩৭, ৩৯, ৪৪, ৪৫ নম্বর শিলালিপি দ্রষ্টব্য।

৫। পরে দেখ।

৬। যথা,—অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, ক্ষায়িকসম্যক্, ক্ষায়িকচারিত্র, অনন্তদান, অনন্তলাভ, অনন্তভোগ, অনন্তোপভোগ ও অনন্তবীর্য্য।

৭। খণ্ডখাদ্যক, ৩।১৪।

লক্ষণা প্রয়োগে বলা হয়, কৃত = ৪।"[১] এই প্রকারের দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রায়ও এক স্থলে অসাধারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাশীরাম দাস মহাভারতের আদি-পর্ব্বের সমাপ্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—[২]

"শকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে।
রুক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥"

শ্রীযুক্ত রায়ের মতে রুক্মিণীনন্দন = কাম = ৫; কারণ, "কামের পঞ্চ শর।" কাম সংজ্ঞা কুত্রাপি পাই নাই; তাঁহার কোষেও নাই। একমাত্র পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে (৬।৫) দেখিয়াছি, কামশর = ৫। এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত রায়ের উক্ত প্রতিবাদকে আমরা নিঃসার মনে করি।[৩]

বস্তুত কোন সংখ্যা-সংজ্ঞার উপপত্তি নিরূপণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। যে কালে, যে স্থলে সংজ্ঞাটির প্রথম সৃষ্টি হয়, সেই কাল ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিলে, তৎকালীন সভ্যতার বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে না পারিলে, বিশেষত সংজ্ঞাস্রষ্টার তৎকালীন মনোভাব কল্পনা করিতে না পারিলে, সংজ্ঞার উপপত্তি নিরূপণ হইতে পারে না। বৈদিক ও পৌরাণিক মনোবৃত্তির যুগে নির্ব্বাচিত সংজ্ঞা যে ভিন্ন, একই সংজ্ঞাবিশেষের পারিভাষিক অর্থ যে বিভিন্ন কালে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি যে, সংখ্যা-সংজ্ঞার মধ্যে হিন্দুর জাতি ও দেশের বহু প্রাচীন কাহিনী ও সভ্যতার ইতিহাস নিহিত আছে। "তাহাদের উপপত্তি সন্ধান করিতে গেলে…ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার কোন কোন লুপ্ত তত্ত্বও ব্যক্ত হইয়া পড়িবে মনে হয়।" শ্রীযুক্ত রায়ও স্বীকার করেন যে, "সেগুলি ঐতিহাসিক বীজপুট।"

শ্রুতিতে কখন কখন অপরূপ উপপত্তি নির্দ্দেশিত হইত দেখা যায়। যেমন একুশ সংখ্যার আদিত্য[৪] সংজ্ঞা,—

"একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যঃ"

"এই হেতু ঐ আদিত্য একবিংশ।" শ্রুতি নিজেই আবার সেই হেতুটা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—

"দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ"—

১। "কৃতযুগে ধর্ম্মস্য চতুষ্পাদত্বাৎ তৎপদেন লক্ষণয়া চতুঃসংখ্যা"—সিদ্ধান্তশিরোমণি, মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ২৮-৯ শ্লোকের টীকা, মরীচি।

২। শ্রীযুক্ত রায়ের প্রবন্ধে ধৃত, 'প্রবাসী', ১৩৩৬, পৌষ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

৩। শ্রীযুক্ত রায় পরে বিবদমান বিষয়ে তাঁহার মত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি লেখককে পত্রে জানাইয়াছেন, "যোগ = ৮, হইতে পারে। কারণ, যোগের প্রত্যেক অঙ্গকে যোগ বলা যায়, কিন্তু ব্যবহার নাই, সিদ্ধি = ৮, হইতে সিদ্ধ = ৮, হইতে পারে না। কারণ, অষ্টসিদ্ধির এক এক বিষয়ে সিদ্ধ যোগী ছিলেন কি?" এ স্থলে আরো একটা কথা বলা উচিত। 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র রচনাকাল সম্বন্ধে যে তিনি আমার ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমার কিছু বলার নাই। কারণ, উহা নিরূপণের উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমার লক্ষ্য গণিতের ইতিহাস নির্ণয়। সেই সম্বন্ধে কেহ যদি সাধারণবিধিবহির্ভূত অদ্ভুত কথা বলেন, তাহাতে সংশয় করা গণিতেতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্তও। পক্ষান্তরে নানা নিঃসন্দিগ্ধ ও অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে উক্তিবিশেষের সমর্থন করিতে পারিলে সকলে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

৪। এই শ্রুতির মূল অনুসন্ধানে কোন প্রয়াস করি নাই। আচার্য্য শঙ্কর ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। পরে দ্রষ্টব্য)।

অর্থাৎ "দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, এই তিন লোক এবং ঐ আদিত্য—এইরূপে আদিত্য একবিংশ।" ঐতরেয় আরণ্যকে[১] পঁচিশ সংখ্যার 'পুরুষ' সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষো দশ হস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশ পাদ্যা দ্বা উরূ দ্বৌ বাহূ আত্মৈব পঞ্চবিংশ-স্তমিমমাত্মানং পঞ্চবিংশং সংস্কুরুতে।"

অর্থাৎ 'পুরুষ পঞ্চবিংশ, তাহার দশ হস্তাঙ্গুল, দশ পাদাঙ্গুল, দুই উরু, দুই বাহু ও এক আত্মা; একুনে পঁচিশ। সেই হেতু পুরুষকে পঞ্চবিংশ বলা হয়।" আধুনিক কালে প্রচলিত সংখ্যা-সংজ্ঞার মূল নির্ণয় কেহ ঐ প্রকারে করেন না। কেহ করিলে বিদ্বৎসমাজ তাহা গ্রহণ করিবেন না। অধিকন্তু ব্যাখ্যাতা উপহাসাস্পদ হইবেন। অথচ বৈদিক যুগের লোকে ঐ প্রকার তত্ত্বাবলম্বনে সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিত এবং সেই ব্যাখ্যা পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃতও হইত। ঐ প্রকারের উপপত্তি নির্ণয়ে যে একটা মহাদোষ আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। তখন সংজ্ঞাবিশেষের উপপত্তি নিরূপণ করা মহা দুরূহ, কখন বা অসম্ভব হইবে। আচার্য্য শঙ্কর সত্যই বলিয়াছেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অর্থবাদের অপেক্ষা করিয়াই লোকে ঐ প্রকার উপপত্তি নির্ণয় করিতে পারিয়াছিল।[২] পরবর্ত্তী কালে শ্রুতির ঐ সকল অংশ অপ্রসিদ্ধ হইয়া পরে। তাই নামসংখ্যায় আদিত্য = ২১, পুরুষ = ২৫, সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এখন আদিত্য = ১২, ব্যবহারই সুপ্রচলিত; পুরুষ সংজ্ঞা লুপ্ত।

অঙ্কের "শূন্য" (০)কে নামসংখ্যায় বিন্দু, আকাশ, খ ইত্যাদি বলা হয়। বেশীর ভাগ সংজ্ঞা আকাশের পর্য্যায় শব্দ। ঐ সংজ্ঞার এবং 'শূন্য' নামের উপপত্তি কি? শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, "বিন্দু, যেমন জলবিন্দু, অতি ক্ষুদ্র, নিরবয়ব; এত ক্ষুদ্র যে, শূন্য মনে হয়। ইহা হইতে বিন্দুর সংজ্ঞা, শূন্য। যদি শূন্য, তাহা হইলে অভাব, অতএব আকাশ,..." (২২৮ পৃষ্ঠা)। অতএব দেখা যায় যে, তিনি ০, এই অঙ্কচিহ্নের 'বিন্দু' নামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞাত ইতিহাসের সাক্ষী তাহার সমর্থন করে না। শূন্য নাম পাওয়া যায় 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে' (৮।২৯,৩০), বক্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে, 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় (৪।৭, ১১ ইত্যাদি) ও পরবর্ত্তী গ্রন্থে। খ সংজ্ঞা (ও তাহার পর্য্যায়) পাওয়া যায়, অগ্নিপুরাণ (১২৩।৩), 'মূল-পুলিশসিদ্ধান্ত' (উৎপলভট্ট ধৃত বচন), পঞ্চসিদ্ধান্তিকা (৩।২,১৭, ইত্যাদি) প্রভৃতিতে। কিন্তু বিন্দু সংজ্ঞা প্রথম দেখিয়াছি, পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় (৩।৭,৯)।[৩] সুতরাং দেখা যায় যে, শূন্য সংজ্ঞা প্রাচীন।[৪] আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'অমরকোষের' মতে শূন্য ও বিন্দু শব্দ সমানার্থক নহে। উহা প্রথম দেখিয়াছি, হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি'তে, শক একাদশ শতকে।

১। ১।১।২।৮; ১।১।৪।২০। এই দৃষ্টান্তটির সন্ধান আমার সহোদর শ্রীমান্ বিনোদবিহারী দত্ত দিয়াছে। সে বলে যে, ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত শ্রুতি ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে আরো আছে।

২। "প্রসিদ্ধা চার্থবাদান্তরাপেক্ষ্য অর্থবাদান্তরা প্রবৃত্তিঃ 'একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যঃ' ইত্যেবমাদিষু। কথং হীহৈকবিংশত্যাদ্যভিধীয়তে অনপেক্ষ্যমানোঽর্থবাদান্তরে 'দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ' ইত্যেতস্মিন্।"—শারীরকভাষ্য, ৩।৩।২৬।

৩। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র এই দুইটি শ্লোক ভ্রমপূর্ণ বলিয়া থিবো এবং দ্বিবেদী তাহার কোন অর্থ করেন নাই। কিন্তু সমগ্র শ্লোকের অর্থ নির্গত করিতে পারা না গেলেও উহাতে যে বিন্দু = ০, সংজ্ঞার ব্যবহার আছে, তাহাতে সংশয় নাই। শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার নিঘণ্টুতে (যেটা পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে সঙ্কলিত) বিন্দু সংজ্ঞা ধরেন নাই। যাহা হউক, এই প্রমাণ পরিত্যক্ত হইলে বিন্দুসংজ্ঞা আরো পরবর্ত্তী কালের হইয়া পড়ে।

৪। অবশ্য খ ও বিন্দু শব্দ বেদে বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উভয় শব্দই প্রাচীন। কিন্তু তাহাদের গণিতসম্পর্কে ব্যবহারের কথাই আমরা বলিতেছি।

অবশ্য তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে শূন্যকে বিন্দু বলা হয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা উহাকে "আবেকস" নামে গণনা-যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ প্রকার যন্ত্র প্রাচীন চীনে, মিশরে, গ্রীস ও রোম দেশে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল।[১] চীনে এখনও দেখা যায়। প্রাচীন হিন্দুস্থানে কোন প্রকারের গণনা-যন্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ফ্লীট[২] একদা একটা প্রমাণাবিষ্কারের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা যে তাঁহার ভুল, তাহা আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি।[৩] সুতরাং পাশ্চাত্ত্য মত ভিত্তিহীন বলিয়া পরিত্যাজ্য। শূন্য নামের মূল কি, তাহা নির্ণীত হওয়া অত্যাবশ্যক। 'আকাশ' ও তৎপর্য্যায় শব্দ কেন 'শূন্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তৎসম্বন্ধে মুনীশ্বর বলেন,"আকাশস্য মহত্ত্বেনেয়ত্তাভাবাৎ তদ্বাচকশব্দানাং সঙ্কেতেন বা স্থানাভাব-দ্যোতকশূন্যাভিধেয়ত্বাৎ"।[৪]

বরাহের বৃহজ্জাতকের[৫] মতে খ = ১০। এই প্রয়োগের উপপত্তি কি? 'দীপিকা' নামক ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থে[৬] দেখা যায়—"খম্ লগ্নাৎ দশমরাশিঃ"। কিন্তু বৃহজ্জাতকে এই প্রকারের কোন কথা পাই নাই। টীকাকার উৎপল ভট্টও বলেন নাই।[৭] তাঁহারা মাত্র বলিয়াছেন, খ = আকাশ.[৮] দীপিকাকার অর্ব্বাচীন লোক। বরাহের ব্যবহার দেখিয়া তিনি ঐ সংজ্ঞা করিয়া থাকিবেন। বরাহের পূর্ব্বে গর্গও প্রয়োগ করিয়াছেন,[৯] খ = ১০।

শূন্যের আর একটা সংজ্ঞা পূর্ণ। শ্রীযুক্ত রায় বলেন, "বোধ হয়, বৃত্তাকার বিন্দুচিহ্ন দেখিয়া এই নাম।" আমার মনে হইয়াছিল, আকাশের পূর্ণতা গুণ হইতে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি। আকাশ অনন্ত বলিয়া যেমন অনন্ত = আকাশ = ০, সেইরূপ আকাশ পূর্ণতার প্রতীক বলিয়া পূর্ণ = আকাশ = ০। ইহাতে শুক্লযজুর্ব্বেদের শান্তিপাঠের কথা মনে পড়ে,—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

শ্রুতিতে বহু স্থানে পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম আকাশ নামেও অভিহিত হইয়াছেন।[১০] অমরসিংহ ও হেমচন্দ্রের মতে শূন্যের এক নাম তুচ্ছ। ইহার সঙ্গে ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্তে'র[১১] এই ঋক্ তুলনীয়—"তুচ্ছেনাভ্বাপিহিতং" ইত্যাদি।

১। D. E. Smith, *History of Mathematics*, vol. ii, Boston, 1925, pp. 156 ff.

২। J. F. Feet, "The use of the abacus in India", *Journ. Roy. Asiat. Soc.*, 1911.

৩। Bibhutibhusan Datta, "Early literary evidence of the use of the zero in India," *Amer. Math. Monthly*, vol. 33, 1926, pp. 449—454.

৪। মুনীশ্বরকৃত 'মরীচি', মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ১৮ শ্লোক। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র গ্রহগণিত ভাগের মধ্যমাধিকার, মুনীশ্বরের 'মরীচি' ও নৃসিংহের 'বাসনাবার্ত্তিক' সহ পণ্ডিত মুরলীধর ঝার সম্পাদনায়, বাঙ্গী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খ্রীষ্ট সাল।

৫। বরাহমিহিরের 'বৃহজ্জাতক' উৎপল ভট্টের টীকা সহ, রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে কলিকাতা, ১৩০০ বঙ্গাব্দে; ১।১৭; ১১৬,১৭,১৮,২৩,৬,৭; প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৬। এই গ্রন্থ আমি দেখি নাই। অনুবাদিত বাক্যটি 'শব্দকল্পদ্রুমে' পাইয়াছি। ('খম্' শব্দ দেখ)।

৭। দ্রষ্টব্য বৃহজ্জাতক ১।২০ টীকা।

৮। 'বৃহজ্জাতক' ১।১৭ (টীকা) ও ২।৬ দ্রষ্টব্য।

৯। 'বৃহজ্জাতকে'র (১।১৭) টীকায় উৎপল ভট্ট ধৃত বচন দ্রষ্টব্য।

১০। "এষ আকাশ"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। 'বেদান্তদর্শনে' উহা বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, (১।১।২২, ১।৩।৪১ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১১। ১০।১২৯।

গো = ৯, সংজ্ঞার উৎপত্তি সুধাকর দ্বিবেদী করিয়াছেন পুরাণের নন্দিনী প্রভৃতি নয়টি গাভী হইতে। নন্দিনীবংশ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীযুক্ত রায় ঐ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অপর কোন প্রকৃষ্ট উপায় না দেখিয়া তিনি মনে করেন, গো = স্বর্গ = ৯। "গো অর্থে স্বর্গ ধরিতে হইতেছে। দেখা যাইতেছে, গো সংজ্ঞা বরাহের স্বর্গতি।" জৈন আগমশাস্ত্রের সংস্কৃত টীকায় কতিপয় স্থলে, 'গমন করে বলিয়াই গো', এই নিরুক্তি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, গো = গ্রহ = ৯। ব্যূলার[১] ও সেই উপপত্তি ধরিয়াছেন দেখিতেছি। মুনীশ্বর বলেন যে, 'নবখণ্ডাত্মক ভূমি' হইতেই গো সংজ্ঞার উৎপত্তি।[২] ভূপ (= ১৬) সংজ্ঞার উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীযুক্ত রায় দুইটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন,—বিষ্ণুপুরাণোক্ত ষোল শক রাজার কাহিনী এবং মহাভারতোক্ত 'ষোড়শরাজিক' উপাখ্যান। তিনি প্রথমটা স্বীকার করিয়াছেন, ব্যূলার করিয়াছেন শেষেরটাকে। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র মতে শক = ১১; উহাতে ভূপ সংজ্ঞা পাই নাই। অতএব ষোল শকরাজকাহিনী হইতে ভূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি কি না, বিবেচ্য। একাদশ শক সংজ্ঞার উপপত্তি কি?

পবন (পর্য্যায় অনিল, বায়ু, সমীরণ, ইত্যাদি) সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, দ্বিবেদী তাহা দেখাইয়াছেন।[৩] ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে সাতটি পবন প্রসিদ্ধ; যথা,—আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ ও পরাবহ। তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভমণ্ডল ঘুরিতেছে, ভভ্রমমাদী প্রাচীনেরা মনে করিতেন। সেই হিসাবে পবন = ৭। উৎপল ভট্ট অনুবাদিত কতিপয় জ্যোতিষবচনে উহা পাওয়া যায়।[৪] প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ুর নিরুক্তিতে অপরে ধরিয়াছেন, পবন = ৫। ইহার দৃষ্টান্ত আছে বরাহের 'বৃহজ্জাতকে', শ্রীপতির 'সিদ্ধান্তশেখরে' (১।২৭) ও ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে।[৫] কাহারও কাহারও মতে আবার মরুৎ = ৪৯। কারণ, পুরাণে উনপঞ্চাশ মরুতের কাহিনী আছে। দুর্গাপূজায় 'সপ্তসপ্তমরুদ্গণ'কে অর্ঘ্য দিতে হয়। অলবিরুণীর তালিকায় দেখা যায়, পবন = ৯। উহা ভুল। কারণ, তাহার উপপত্তিও হয় না। অপরন্তু কোন প্রয়োগও দেখা যায় না।

ব্যূলার লিখিয়াছেন যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকার মতে নরক = ৪০। উহা সত্য নহে। মূলে আছে, "পঞ্চনরকং শতার্দ্ধং ত্রিসমেতং" ইত্যাদি।[৬] ঐ স্থলে 'পঞ্চনরকং' অর্থ পঞ্চচত্বারিংশৎ করিতেই হইবে, নতুবা গণনায় মিলিবে না। 'শতার্দ্ধং ত্রিসমেতং' অর্থ 'তিনোত্তর পঞ্চাশ' দেখিয়া ব্যূলার ভ্রমে পড়িয়াছেন; মনে করিয়াছেন, 'পঞ্চনরকং' অর্থও 'পঞ্চোত্তর নরক।' তাহাতে নরক = ৪০, হয়। কিন্তু দ্বিবেদী ও শ্রীযুক্ত রায় ঐ বাক্যের অর্থ 'পঞ্চগুণ নরক' করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের মতে নরক = ৯। এই ব্যাখ্যাই সমীচীন ও প্রকৃত, নরক = ৪০, ব্যাখ্যা যে ভুল, তাহা প্রমাণ করা যায়। বরাহ কোথাও স্পষ্টোল্লেখ ব্যতীত যোগবিধি মতে

১। নামসংখ্যানিঘণ্টু দ্রষ্টব্য।
২। সিদ্ধান্তশিরোমণি, মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ২৮—৯ শ্লোকের টীকা (মরীচি)।
৩। 'বৃহৎসংহিতা', ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা।
৪। বৃহৎসংহিতা, ২ অধ্যায় টীকা (৪০ ২৭, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
৫। গণিতাধ্যায়, গ্রহযুত্যধিকার, ২য় শ্লোক।
৬। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ৪।৯

নামসংখ্যা ব্যবহার করেন নাই। গুণবিধির অবলম্বন সময় সময় করিয়াছেন বটে।[১] তারপর বরাহের স্বর্গতি সংজ্ঞার সঙ্গে নরক সংজ্ঞার সম্পর্ক আছে।[২] স্বর্গতির বিপরীত দুর্গতি বা নরক। বরাহের মতে স্বর্গতি=৯, সুতরাং নরক=৯। এই দুইটা সংজ্ঞার উৎপত্তি কোথায়? শ্রীযুক্ত রায়ও খুঁজিয়া পান নাই। স্বর্গের সংখ্যা সম্বন্ধে শ্রুতিতে ও পুরাণে বহু প্রকারের মত দৃষ্ট হয়। তবে তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক মত পাওয়া যায়,[২]—

"নব স্বর্গলোকাঃ"

"স্বর্গলোক নয়টি।" উহা হইতে স্বর্গ=৯, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে পারে। বিপরীত ক্রমে নরক=৯, ব্যবহারের উৎপত্তি। "হইতে পারে" বলিতেছি; কারণ, ঐ সকল ব্রাহ্মণে ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। তথায় দশ, একাদশ বা সহস্র সংখ্যক স্বর্গের রূপক কল্পনাও আছে।[৩] সেগুলি স্বীকৃত হয় নাই কেন, জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিব?

'শ্রুতবোধ' নামে এক ছন্দোগ্রন্থে দুইটা নূতন সংজ্ঞা পাওয়া যায়,[৪] গিরীন্দ্র=৮, ফণভৃৎকুল=৯। গিরীন্দ্র বলিতে গিরিরাজ হিমালয়কেই বুঝায়। ঐ স্থলে উহা গিরি সংজ্ঞার উপলক্ষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই হিসাবে গিরীন্দ্র=৭, হওয়া উচিত ছিল। কারণ, কুলাচল সাতটি। আরো বিশেষ কথা যে, হিমালয় সপ্ত কুলাচলের বাহিরে। সুতরাং তাহাকে কুলাচলের উপলক্ষণ করা আশ্চর্য্য। তবে পরবর্ত্তী কালে অষ্ট কুলাচলের প্রসঙ্গও শোনা যায়। আচার্য্য শঙ্করের 'মোহমুদ্গরে' আছে,—"অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ।" তখন হিমালয়কে কুলাচলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু উহা হইতেই গিরীন্দ্র=৮ ব্যবহারের উৎপত্তি বলিতে হইবে। বস্তুতঃ 'শ্রুতবোধের'[৫] মতে গিরি=৮। 'ফণভৃৎকুল' অর্থ 'সর্পকুল'। সুতরাং উহা আট সংখ্যা-জ্ঞাপক হওয়া উচিত ছিল। কারণ, সর্পবংশের প্রধান অনন্তাদি আটটি। নাগপঞ্চমী পূজাতে অনন্তাদি অষ্ট নাগের পূজা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নাম সংখ্যায় নাগ=৮, সাধারণতই বুঝাইয়া থাকে। 'শ্রুতবোধে'র প্রয়োগ অসাধারণ। অপর কোন গ্রন্থে ঐ প্রকার প্রয়োগ পাই নাই। উহারও উপপত্তি হইতে পারে। প্রায় পুরাণের মতে প্রধান নাগ আটটি হইলেও বরাহপুরাণের মতে নয়টি।[৬] মনিয়র উইলিয়ম্‌স্

১। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় আছে, "নবষটকঃ"=৯×৬; "ষট্‌কাষ্টকঃ"=৬×৮; "দ্বিত্রিভূতাঃ"=২(৩×৫), ইত্যাদি।

২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।২।২।১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪।১৬

৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।৯।৪।৬; ৩।১২।৫।৭-৮; ঐতরের ব্রাহ্মণ ২।১৭, দ্রষ্টব্য। আরো দ্রষ্টব্য শতপথব্রাহ্মণ ১৩।১।৩।১; গোপথ ব্রাহ্মণ ৬।২ প্রভৃতি।

৪। ৩৮ শ্লোক। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইহাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৫। ৩৫ শ্লোক।

৬। "অনন্তং বাসুকিঞ্চৈব কম্বলঞ্চ মহাবলম্।
কর্কোটকঞ্চ রাজেন্দ্র পদ্মঞ্চাঙ্গং সরীসৃপম্॥
মহাপদ্মং তথা শঙ্খং কুলিকঞ্চাপরাজিতম্।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ প্রধানাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
—বরাহপুরাণ [শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত]।

লিখিয়াছেন,১ 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে'র মতে নাগ = ৭। শ্রীযুক্ত রায়ের প্রদত্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের নিঘণ্টুতে ঐ ব্যবহার নাই। অপর কোথাও নাগ সংজ্ঞার ঐ প্রয়োগ দেখি নাই। মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ ভুল করিয়া থাকিবেন।

চম্পালিপিতে কতকগুলি নূতন সংজ্ঞা আছে ;—আত্মা = ৯, আনন্দ = ৬, কায় = ৮, রুচ = ২, তনু = ৮, অঙ্গ = ৮, বেলা = ২, হস্ত = ২। নদী বা সমুদ্রের বেলাভূমি দুইটি। সেই হেতু বেলা = ২। আত্মা = ৯, প্রয়োগের উপপত্তি কি, বুঝি না। হয় ত চম্পালিপিতে ঐ সংজ্ঞার ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আত্মা = ৫, হইবে। পঞ্চাত্মা সাধারণের পরিচিত। তনু সংজ্ঞার উৎপত্তি শিবের তনুর আট উপাদান হইতে,—পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র এবং যজমান। অমর কবি কালিদাসের অমর নাটক শকুন্তলার মঙ্গলাচরণের কথা মনে পড়ে,—

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যাচ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

সেই হেতু শিবের অপর নাম অষ্টমূর্ত্তি, অষ্টধর। কায় সংজ্ঞার উৎপত্তিও তাহাই, কায় = তনু। অঙ্গ সংজ্ঞা নামসংখ্যায় সাধারণতঃ ৬ জ্ঞাপন করে,—বেদের ষড়ঙ্গ হইতে তাহার উৎপত্তি। অঙ্গ = ৮, ব্যবহারের উৎপত্তি হইতে পারে,—(১) আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ হইতে, (২) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বা প্রণামের অষ্টাঙ্গ হইতে,২ (৩) যোগের অষ্টাঙ্গ হইতে,৩ (৪) অর্ঘ্যের অষ্টাঙ্গ হইতে,৪ অথবা (৫) তনু শব্দের পর্য্যায় হিসাবে। আনন্দ সংজ্ঞার উৎপত্তি রস সংজ্ঞার৫

১। M. Monier-Williams, *Sanskrit-English Dictionary*, New edition, revised and improved by E. Leumann and C. Cappeller, Oxford, 1899 ; নাগ ও ফণভৃৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।

২। প্রণামের অষ্টাঙ্গ—পাদ, জানু, বক্ষ, হস্ত, শির, বাক্য, দৃষ্টি ও মন।

৩। যোগের অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

৪। অর্ঘ্যের অষ্টাঙ্গ—দুই প্রকার ; তন্ত্রমতে—জল, দুধ, দধি, ঘৃত, কুশাগ্র, তণ্ডুল, যব ও শ্বেতসর্ষপ ; কাশীখণ্ডের মতে—জল, দুধ, দধি, ঘৃত, মধু, কুশাগ্র, রক্তকরবী ও রক্ত চন্দন। শব্দকল্পদ্রুম দেখ।

৫। পূর্ব্বপ্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' হইতে দুই ছত্র কবিতার অনুবাদ ছিল,—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
এই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা॥"

ইহাতে পাওয়া যায় যে, ১৬৭৪ শককালে 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয়। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে মুদ্রাকরের প্রমাদে ১৭৭৪ শক মুদ্রিত হয়। তাহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত রায় মনে করিয়াছেন যে, রসসংজ্ঞা সাধারণতঃ ৬ বা ৯ সংখ্যা খ্যাপনার্থ ব্যবহৃত হইলেও, আমি ভিন্নোপায়ে পরিজ্ঞাত 'অন্নদামঙ্গলে'র রচনাকালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কথঞ্চিৎ জোর করিয়া উপপত্তিহীন হইলেও রস = ৭, ধরিয়াছি। [প্রবাসী ৩৪৭—৮ পৃষ্ঠা]। ঐ দোষ আমি করি নাই। আমার প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিতে ১৬৭৪ই ছিল ও আছে। মুদ্রিত প্রবন্ধে মুদ্রাকরের দোষে ১৭৭৪ হইয়াছে।

পর্য্যায় হিসাবে। আনন্দ = রস = ৬। শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম কখন রস, আবার আনন্দ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন,—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ।১

'তিনিই [ব্রহ্ম] রস। সেই রসকে লাভ করিয়াই ইনি [জীব] আনন্দিত হন। যদি সেই আকাশ ও আনন্দ না থাকিতেন, তবে কে-ই বা জীবিত থাকিত, কে-ই বা প্রাণকার্য্য করিত ?'

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

১। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ৭ শ্রুতি।

জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা *

১৩৩৫ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিকা'য় (৮-৩০ পৃষ্ঠা) আমরা নামসংখ্যা-প্রণালী বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সময় পর্য্যন্ত নামসংখ্যার উৎপত্তি, প্রয়োগ ও ক্রমপরিণতির সমগ্র ইতিহাস যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছিল। ১৩৩৬ সালের 'পত্রিকা'য় অপর এক প্রবন্ধে ঐ বিষয়ের পুনরালোচনা করি। তাহাতে মুখ্যতঃ নামসংখ্যা নিঘণ্টু সঙ্কলনের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস এবং কতকগুলি সংজ্ঞার উপপত্তি ও প্রয়োগেতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রথম প্রবন্ধের দু'একটি স্থল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্রকলেবর প্রবন্ধের অবতারণা।

অর্দ্ধমাগধী সাহিত্য

প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন অর্দ্ধমাগধী সাহিত্যে নামসংখ্যার ব্যবহার নাই। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত 'বৃহদ্‌গচ্ছের গুর্ব্বাবলী' হইতে নামসংখ্যা প্রয়োগের একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করা গিয়াছিল যে, "এই প্রকার প্রমাণও অতীব বিরল।" এই সকল কথার সংশোধন আবশ্যক। জৈন আগম গ্রন্থাদিতে (৫০০—৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সাল) নামসংখ্যা প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাই নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে রচিত 'অনুযোগদ্বার-সূত্রে' একমাত্র রূপ(=১) সংজ্ঞার প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়।[১] কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জিনভদ্রগণি নামসংখ্যার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—"পণ সত্তগ তিগ পণ তিগ দুগ চউট্ঠিক্কো"[২] = ১৮৪২৩৫৩৭৫ ; "সুন্নিংদিয় দুগ পংচয় ইক্কগ তিগ"[৩] = ৩১৫২৫০ ; ইত্যাদি। আচার্য্য নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "বার থং ছক্কং"[৪] = ৬০১২ ; "পণ্ণাসমেকদালং ণব ছপ্পণ্ণাসসুণ্ণবসদরী"[৫] = ৭৯০৫৬৯৪১৫০ ;"ছাদালসুণ্ণসত্তয়বাবণ্ণং"[৬] = ৫২৭০৪৬ ইত্যাদি[৭]।

---

* ১৩৩৭, ৭ই আষাঢ় তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। 'অনুযোগদ্বারসূত্র,' হেমচন্দ্র সূরি কৃত টীকা সহ, ১৯৮০ বিক্রমসম্বতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ; ১৪৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২। জিনভদ্রগণি প্রণীত 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস' মলয়গিরি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৭ বিক্রমসম্বতে ভাবনগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ; ১।৮৫ দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ, ১।৩৯১

৪। নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'গোম্মটসার', কেশববর্ণীকৃত 'জীবতত্ত্বপ্রদীপিকা', অভয়চন্দ্র কৃত 'মন্দপ্রবোধিকা' এবং টোডরমলজি কৃত হিন্দিভাষা টীকা সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ; জীবকাণ্ড, ১২৫ গাথা।

৫। ত্রিলোকসার, ৩১৩ গাথা। [পঞ্চাশদেকচত্বারিংশন্নবষট্‌পঞ্চাশচ্ছূন্যং নবসপ্ততিঃ] নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'ত্রিলোকসার' মাধবচন্দ্র ত্রৈবিদ্যদেব কৃত ব্যাখ্যা সহিত, ১৯৭৫ বিক্রমসম্বতে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা ; [ষট্‌চত্বারিংশচ্ছূন্যসপ্তকদ্বিপঞ্চাশৎ]

৭। ত্রিলোকসার, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯৩ গাথা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন জৈন গাথাসাহিত্যেও নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়; যথা—"পণস্থন্নং চউরাসীয়" = ৮৪০০০০০।

"ছত্তিন্নি তিন্নি স্থন্নং পংচেব য ণব য তিন্নি চত্তারি।
পংচেব তিন্নি ণব পংচ সত্ত তিন্নেব তিন্নেব॥
চউ ছ দ্দো চউ এক্কো পণ দো ছক্কেক্কসো য অট্‌ঠেব।
দো দো নব সত্তেব য অংকট্‌ঠানা পরাহুত্তা॥"

অর্থাৎ ৭৯,২২৮,১৬২,৫১৪,২৬৪,৩৩৭,৫৯৩,৫৪৩, ৯৫০,৩৩৬। এই সকল গাথা যে কত কালের প্রাচীন, তাহা নিরূপণ করিতে পারি নাই। কোন কোন জৈন গাথা অতি প্রাচীন কালের। এমন কি, কোন কোন আগমগ্রন্থেও গাথার অনুবাদ আছে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা প্রথম দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাইয়াছি, অভয়দেব সূরির (১০৫০ খ্রীষ্টসাল) টীকাতে[১] এবং অপরটা হেমচন্দ্র সূরির (১০৮৯-১১৭৩ খ্রীষ্টসাল) টীকা গ্রন্থে।[২] গুণচন্দ্রগণি "নংদসিহিরুদ্দ" (= ১১৩৯) বিক্রমসম্বতে আপনার 'মহাবীরচরিয়ম্' রচনা করেন।[৩] বাদিরাজসূরি "শাকাব্দে নগবাধিরন্ধ্র (৯৪৭) গণনে সংবৎসরে" 'পার্শ্বনাথচরিয়ম্' রচনা সমাপ্ত করেন।

মধ্যযুগের জৈন সংস্কৃত সাহিত্য

মধ্যযুগের জৈনগণ সংস্কৃত ভাষায় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ—মৌলিক ও টীকা, উভয় প্রকারেরই—রচনা করিতেন। ঐ সকল গ্রন্থে নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। জৈনাচার্য্য জিনসেন তৎকৃত 'নেমিপুরাণ' বা 'জৈন হরিবংশ পুরাণে' তাহার বহুল উপযোগ করিয়াছেন। একটা প্রমাণ দিতেছি,—

"স্থানক্রমাত্রিকং দ্বে চ ষট্ চত্বারি নব দ্বিকং"[৪]

ঐ স্থলে উদ্দিষ্ট সংখ্যা ২৯৪৬২৩। জিনসেন ৭০৫ শকে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। পার্শ্বদেবগণি "গ্রহরসরুদ্র" (= ১১৬৯) বিক্রমসম্বতে 'ন্যায়প্রবেশপঞ্জিকা' রচনা করেন[৫]; শ্রীচন্দ্রসূরি "করনয়নসূর্য্য" (= ১২২২) সম্বতে 'শ্রাবকপ্রতিক্রমণসূত্রবৃত্তি' প্রণয়ন করেন[৬]; রত্নপ্রভাসূরি "বসুলোকার্ক" (= ১২৩৮) সম্বতে 'উপদেশমালাবৃত্তি' রচনা করেন।[৭] বোম্বাই প্রদেশে প্রাপ্তব্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিবিষয়ক পিটার্সনের পুস্তকে এই প্রকারের অনেক দৃষ্টান্ত

১। স্থানাঙ্গসূত্র, অভয়দেবসূরি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৫ বিক্রমসম্বতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত; ৯৫ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। অনুযোগদ্বারসূত্র, ১৪২ সূত্রের টীকা।

৩। C. D. Dalal & L. B. Gandhi, *A Catalogue of Manuscripts in the Jaina Bhandars at Jesalmere*, Baroda, 1923, p. 45.

৪। নেমিপুরাণ, ৫ম সর্গ, ৫৫০ (?) শ্লোক। বঙ্গদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ৭৫ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে।

৫। *Dalal & Gandhi, op. cit.*, p. 30.

৬। *Ibid.*, p. 21.

৭। *Ibid.*, p. 40.

আছে।১ প্রসিদ্ধ জৈন টীকাকার মলয়গিরি 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস' ও 'সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি'র উপর তৎকৃত টীকাতে নামসংখ্যার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন।২ তিনি দ্বাদশ খ্রীষ্টশতকের শেষ ভাগে গুজরাটরাজ কুমারপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শান্তিচন্দ্রগণি নামে অপর এক জৈন টীকাকারও কতিপয় স্থলে নামসংখ্যার উপযোগ করিয়াছেন৩। তিনি ১৫৯৫ খ্রীষ্টসালে জীবিত ছিলেন।

দক্ষিণাগতি

প্রথম প্রবন্ধে অকাট্য প্রমাণ সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নামসংখ্যা সহায়ে বিজ্ঞাপিত সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে সাধারণতঃ বামাগতি অবলম্বনীয় হইলেও কখনো কখনো দক্ষিণাগতিও অনুসরণ করিতে হয়। তাহাতে উদ্ধৃত প্রমাণদৃষ্টে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীন নহে; হয় ত পঞ্চদশ খ্রীষ্টশতকের পূর্ব্বকালের নহে। ঐ সময়ে আমিও ঐরূপ মনে করিতাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের ধারণাও তাহা দেখিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, "অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীনত্বের বিরোধী।"৪ দক্ষিণাগতি কত কালের, ইহা স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রকারান্তরে বোঝা যায় যে, উহা ১৪০৩ খ্রীষ্ট সালের অর্ব্বাচীন বলিয়া তাঁহার ধারণা। যাহা হউক, আমাদের ঐ ধারণা ভুল। কারণ, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতকে মলয়গিরি, দশম শতকে নেমিচন্দ্র, অষ্টম শতকে জিনসেন এবং ষষ্ঠ শতকে জিনভদ্রগণি দক্ষিণাগতির অনুসরণ করিয়াছেন দেখা যায়। বস্তুতঃ 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস' ও 'সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি'র টীকার কুত্রাপি মলয়গিরি বামাগতি অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার মতে "অষ্টকঃ পঞ্চকঃ সপ্তকঃ সপ্তকঃ শূন্যং দ্বিকঃ চতুষ্কঃ ত্রিকঃ সপ্তকঃ পঞ্চকঃ"৫ = ৮৫৭৭০২৪৩৭৫; "ত্রিকঃ চতুষ্কঃ ত্রিকঃ শূন্যং সপ্তকো নবকঃ ত্রিকঃ শূন্যং এককঃ সপ্তকঃ ষট্‌কঃ"৬ = ৩৪৩০৭৯৩০১৭৬; "এককো দ্বিকোঽষ্টকস্ত্রিকঃ ষট্‌কোঽষ্টকো নবকঃ"৭ = ১২৮৩৬৮৯, ইত্যাদি। নেমিচন্দ্র, জিনসেন এবং জিনভদ্রগণির গ্রন্থে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়েরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নেমিচন্দ্র লিখিয়াছেন,৮—

১। Peterson, *Fourth Report on the Search of Sanskrit MSS. in the Bombay Presidency.* "শরঋতুদর্চিঃ শশাঙ্ক" = ১৩৬৫ (p. 67); "দ্ব্যঙ্কমনু" = ১৪৯২ (p. 83); "বানাষ্টবিশ্বদেব" = ১০৮৫, "বসুবস্বাশা" = ১০৮৮, "বসুবস্বর্ক" = ১২৮৮ (p. 92), ইত্যাদি।

২। 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস টীকা', ১।৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২-৪৫; ৫।৫-৬, ইত্যাদি। 'সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি'-মলয়গিরি কৃত টীকা সহ ১৯৭৫ বিক্রমসম্বতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ২০,২৩ ও ১০০ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। 'জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি', শান্তিচন্দ্রগণি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৬ বিক্রমসম্বতে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত; ১০৩ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। 'প্রবাসী', ১৩৩৯ সাল, পৌষ, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

৫। বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১।৩৬ (টীকা)।

৬। ঐ, ১।৩৮ (টীকা)।

৭। সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, ২০ সূত্র (টীকা)।

৮। গোম্মটসার, ৩৫৪ গাথা;

[একাষ্টচ্চ চ ষট্‌সপ্তকং চ চ চ শূন্যসপ্তত্রিকসপ্ত।
শূন্যং নব পঞ্চ পঞ্চ চ একং ষট্‌কৈকশ্চ পঞ্চকংচ ॥]

"এক্কট্‌ঠ চ চ য ছস্‌সত্তয়ং চ চ য স্থণ্ণ সত্ততিয়সত্তা।
স্থণ্ণং ণব পণ পংচ য এক্কং ছক্কেক্কগো য পণগং চ ॥"

অর্থাৎ ১৮৪,৪৬৭,৪৪০,৭৩৭,০৯৫,৫১৬,১১৫।

"বিধুণিধিণগণবরবিণভণিধিণয়ণবলদ্ধিণিধিখরাহত্থি।
ইগিতীসস্থণ্ণসহিয়া জংবুএ লদ্ধসিদ্ধথা ॥"১

এ স্থলে কথিত সংখ্যা ১৯৭৯১২০৯২৯৯৯৬৮০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০। বিশেষ দ্রষ্টব্য, বল = ৯, ঋদ্ধি = ৯, খর = ৬। বামাগতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত নেমি-চন্দ্রের গ্রন্থ হইতে আমরা পূর্ব্বেই অনুবাদ করিয়াছি। এই প্রকার আরও দেওয়া যাইতে পারে।২ জিনসেন বলেন,—

"একমষ্টৌচ চত্বারি চতুঃ ষট্ সপ্তভিশ্চতুঃ।
চতুঃশূন্যংচ সপ্তত্রিসপ্তশূন্যং নবাপি চ ॥
পঞ্চপঞ্চৈকং ষট্ চ তথৈকং পঞ্চ তত্ত্বতঃ।
সমস্তশ্রুতবর্ণানাং প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতং ॥"৩

অর্থাৎ ১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫। জিনভদ্রগণির মতে "দুবীস চোয়াল স্থণ্ণট্‌ঠ"৪ = ২২৪৪০০০০০০০০০; "ইগবন্না চউবীসং অট্‌ঠ স্থণ্ণ"৫ = ৫১২৪০০০০০০০০; "বত্তীসং দো স্থণ্ণা চউরো স্থণ্ণট্‌ঠ"৬ = ৩২০০৪০০০০০০০০; ইত্যাদি। বামাগতির দুইটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 'বৃহৎক্ষেত্রসমাসে'র অপর কুত্রাপি নামসংখ্যায় বামাগতি অনুসৃত হয় নাই। সর্ব্বত্রই দক্ষিণা গতি। কেহ শঙ্কা করিতে পারেন, ঐ দুই স্থলেও দক্ষিণাগতি অনুসরণ করা যাইতে পারে না কি? না, সেই উপায় নাই। তথায় বামাগতি ধরিতেই হইবে, তাহার অকাট্য কারণ আছে। একটার প্রমাণ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। বস্তুতঃ ঐ সকল গণিত বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। জৈনশাস্ত্র মতে ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের আকৃতি একটা বৃত্তাংশের ন্যায়।

১। ত্রিলোকসার, ২১ গাথা—
[বিধুনিধিনগনবরবিনভোনিধিনয়নবলর্দ্ধিনিধিখরহস্তিনঃ।
একত্রিংশচ্ছূন্যসহিতাঃ জম্বৌ লব্ধসিদ্ধার্থাঃ ॥]

২। গোম্মটসার, জীবকাণ্ড, ৬২৫ গাথা; ত্রিলোকসার, গাথা ২৫, ২৮, ৭৫০।

৩। নেমিপুরাণ, ১০ম সর্গ ৩৯-৪০ শ্লোক; পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপির ১৩৩ম পত্রের ২য় পৃষ্ঠা।

৪। বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১।৬৯,

৫। ঐ, ১।৭০

৬। ঐ, ১।৭১

তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তারের পরিমাণ এই দেওয়া আছে,১—

$ক_২$ = ৪১৪৯০০৯৭৫০০ বর্গকলা।

$খ_২$ = ৭৫৬০০০০০০০০ বর্গকলা।

ব = ৪৫২৫ কলা।

ঐ প্রকার বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল গণনা করিবার জন্য জিনভদ্রগণি এই নিয়ম দিয়াছেন২—

$$ক্ষেত্রফল = \sqrt{\frac{ক^২ + খ^২}{২}} \times ব$$

উত্তরার্দ্ধ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল গণনা করিতে হইলে, এই নিয়মে তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারের প্রমাণাঙ্ক প্রয়োগ করিতে হইবে। অধুনা

$$\sqrt{\frac{ক^২ + খ^২}{২}} = \sqrt{৫৮৫৪৫০৪৮৭৫০} \text{ কলা},$$

$$= ২৪১৯৬০ \frac{৪০৭১৫০}{৪৮৩৯২০} \text{ কলা},$$

$$= ২৪১৯৬০ \frac{৪০৭১৫}{৪৮৩৯২} \text{ কলা},$$

এই বৃহৎ ভগ্নাংশকে জিনভদ্রগণি এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন৩—

"কল লখ্ক দুগং ইয়াল সহস্সা ণব সয়া সঠহিয়া।
সুন্নমবণেউ অংসং চউ সুন্নগ সত্ত এগ পণ॥
ছেউ চউ অট্ঠ তিগ ণব দুগা য বাহে স উত্তরদ্ধস্স।'

এ স্থলে অঙ্কপাতে সর্ব্বত্র দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। উত্তরার্দ্ধ ভারতবর্ষের

$$ক্ষেত্রফল = ২৪১৯৬০ \frac{৪০৭১৫}{৪৮৩৯২} \times ৪৫২৫ \text{ বর্গকলা},$$

$$= ২৪১৯৬০ \times ৪৫২৫ + \frac{৪০৭১৫ \times ৪৫২৫}{৪৮৩৯২} \text{ বর্গকলা},$$

$$= ১০৯৪৮৬৯০০০ + \frac{১৮৪২৩৫৩৭৫}{৪৮৩৯২} \text{ বর্গকলা},$$

এই ভগ্নাংশে লবের উল্লেখ করিতে গিয়া জিনভদ্রগণি বলিয়াছেন৪,—

"পণসত্তগ তিগ পণ তিগ দুগ চউট্ঠিক্কো।"

সুতরাং ইহাতে যে বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকিতে

১। "... ... সত্তাণউই সহস্স পংচসয়া।
অউণাপন্নং কোড়ি ইগয়ালীসং চ কোড়িসয়া॥" ৬৮
"পণসয়রী ছচ্চ অট্ঠসুন্নাইং", ৬৯
—বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১ম অধ্যায়।

২। ১।৬৬

৩। বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১।৮৩-৪।

৪। ঐ, ১।৮৫।

পারে না। জিনভদ্রগণির ব্যবহৃত বামাগতির অপর দৃষ্টান্তও এই প্রকার নিঃসংশয়। তাহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই।

দক্ষিণাগতির এতদপেক্ষাও প্রাচীন একটা দৃষ্টান্ত আছে। একটা বৃহৎ সংখ্যার—কত বৃহৎ, অধুনা বলা যায় না; কারণ, মূলের কতকাংশ ত্রুটিত হইয়া গিয়াছে—উল্লেখ করিতে 'বখ্‌শালী গণিত'কর্ত্তা বলিয়াছেন১,—

"ষড়্‌বিংশচ ত্রিপঞ্চাশ একোনত্রিংশ এব চ।
দ্বাব (ষ্টি) ষড়্‌বিংশ চতুশ্চত্বারিংশ সপ্ততি ॥
চতুঃষষ্টি ন(ব)······ ·········ংশানন্তরম্।
ত্রিরশীতি একবিংশ অষ্ট············পকং ॥"

ঐ গ্রন্থে ইহাকে অঙ্কেও প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা,—

"২৬৫৩২৯৬২২৬৪৪৭০৬৪৯৯৪······৪৩২১৮"

সুতরাং এ স্থলে যে দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাত করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'বখ্‌শালী গণিত' খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট সালের প্রারম্ভে, অথবা তাহার অনতিকাল পরে রচিত হইয়াছিল।২ পরবর্ত্তী কালেও দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শান্তিচন্দ্রগণি (১৫৯৫) একমাত্র ঐ ক্রমেই সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অসমীয়া ভাষার এক গণিতগ্রন্থে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়ই যথেচ্ছভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।৩

বিষম সংশয়

এইরূপে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে নামসংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়ই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে এক বিষম সংশয় উপজাত হয়। সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যবিশেষকে অঙ্কে পাত করিতে কোন্ গতি অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের উপায় কি? সংস্কৃত সাহিত্যে একটা বিধি পাওয়া যায়,

---

১। *The Bakhshali Manuscript—A Study in Mediaeval Mathematics. Parts I and II*, edited by G. R. Kaye, Calcutta, 1927, ৫৮ পত্র, প্রথম দিক্।

২। Bibhutibhusan Datta, "The Bakhshali Mathematics," *Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. 21, pp, 1-60. বিশেষভাবে ৫৫-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। কাঙ্কিনাথ প্রণীত "ধীরমোহিনী অঙ্কার্য্য", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩২৯, ১-৮ পৃষ্ঠা। কাঙ্কিনাথের ব্যবহৃত নামসংখ্যা কতকটা কৌতুককর। তিনি লিখিয়াছেন,—

"মুনি অম্বর পাশা পাথা।
বাণ চন্দ্র দিব লেখা ॥
ঘোড়া ছিত দিবা বাম।"

অর্থাৎ ১৫২২০৭×৭৩=১১,১১১,১১১।

"নবগ্রহ অষ্টবসু সপ্তসাগর ষড়্‌রস বাণ বেদ রাম করৌ নবাস্তক ,অঙ্ক ইহাকে জান,"

অর্থাৎ ৯৮৭৬৫৪৩২।

"সসি রামবাণ অষ্টবসু শূন্য কর বেদ।
সড়রস নবগ্রহ শসি কর জান ॥"

অর্থাৎ ১৫৮০২৪৬৯১২।

"অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" বা "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"। কিন্তু এই বিধি যে সর্ব্ব ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে, তাহা পূর্ব্বে উপস্থাপিত প্রমাণ হইতেই নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ গূঢ় ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, নামসংখ্যা প্রণালীতে দক্ষিণাগতি ব্যবহারের যত প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রায় সমস্তই প্রাকৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে, অথবা প্রাকৃত গ্রন্থের সংস্কৃতে রচিত টীকা হইতে, অথবা জৈনাচার্য্যদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে। সেই হেতু সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত সংখ্যা-বাক্যে না হয় বামাগতিবিধিই মানা যাইবে। কিন্তু অন্যত্র কি কর্ত্তব্য? মলয়গিরি ও শান্তিচন্দ্রগণি নামসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কচিহ্ন দ্বারাও উদ্দিষ্ট সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের লেখাতে সংশয়ের স্থান নাই।

কোন কোন স্থলে ভিন্নোপায়ে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কোন্ গতি অনুসর্ত্তব্য। যথা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বের কাশীরাম দাসকৃত ভাষান্তরের সমাপ্তি-কাল— "চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়" (= ১৫২৬); যোধরাজের 'হাম্মির রসো'র রচনাকাল "চন্দ্রনাগবসুপঞ্চ" (= ১৭৮৫) সম্বৎ; জয়বিজয়গণি-প্রণীত 'সম্মেতশিখররাস'র রচনাকাল "শশিরসস্বরপতি" (= ১৬১৪) বিক্রমসম্বৎ; এবং প্রীতিবিমল সূরি-প্রণীত 'চম্পকশ্রেষ্ঠকথা'র রচনাকাল "শশিরসবাণাগ্নি" (= ১৬৫৩) সম্বৎ। বর্ত্তমানে প্রচলিত শক ও সম্বৎকাল জানি বলিয়াই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এ সকল স্থলে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে, বামাগতি নহে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এখানে বিভ্রাটে পড়িবেন। নেমিচন্দ্রের গ্রন্থে আছে, 'খ বার ইগিদালং'[1] (= ৪১১২০), "গয়ণতিদুগতেবণ্ণং"[2] (= ৫৩২৩০)। এ সকল স্থলে যে বামাগতিক্রমে অঙ্কপাত করিতে হইবে, তাহা নিঃসংশয়। কারণ, অঙ্কের বামে শূন্য থাকিতে পারে না। সেই কারণেই তৎপ্রদত্ত অপর এক দৃষ্টান্তে দক্ষিণাগতি ধরিতে হইবে। যথা,—"সত্তরসং বাণউদী ণভণবসুণ্ণং"[3] (= ১৭৯২০৯০)। তাঁহার অপর কয়েকটি দৃষ্টান্ত অন্য রকমে যাচাই করা যায়। তিনি জম্বুদ্বীপের পরিধির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,[4]—

"জোয়ণসগদুদু ছক্কিগি তিদয়ং" ইত্যাদি;

এবং তাহার ক্ষেত্রফলের পরিমাণ[5]—

"পণ্ণাসমেকদালং ণব ছপ্পণ্ণাসসুণ্ণণবসদরী।" ইত্যাদি।

জম্বুদ্বীপের পরিধি ও ক্ষেত্রফল গণনা করিবার নিয়ম তিনি দিয়াছেন। সেই নিয়মে গণনা করিয়াই নিরূপণ করা যায় যে, এ সকল স্থলে বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। জিনভদ্রগণি সর্ব্বত্র দক্ষিণাগতি ধরিলেও দুই স্থলে যে বামাগতি ধরিয়াছেন, তাহাও

১। ত্রিলোকসার, ৩৪৭ গাথা; [খ দ্বাদশ একচত্বারিংশৎ]
২। ঐ; [গগনত্রিদ্বিকত্রিপঞ্চাশৎ]
৩। ঐ, ৭৫০ গাথা; [সপ্তদশ দ্বানবতিঃ নভোনবশূন্যং]
৪। ঐ, ৩১২ গাথা; [যোজনানাং সপ্তদ্বিদ্বি ষড়েকং ত্রয়ং]
৫। ঐ, ৩১৩ গাথা; [পঞ্চাশদেকচত্বারিংশন্নবষট্ পঞ্চাশচ্ছূন্যং নবসপ্ততিঃ]।

অঙ্কগণনা দ্বারা বুঝিতে পারি। কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও আছে, যে সকল স্থলে সংশয় নিরসনের কোন সহজ উপায় নাই।

কবি চণ্ডিদাসের একটা পদে নাকি আছে[১]—

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
নবছুঁ নবছুঁ রস গীত পরিমাণ॥"

বিধু = ১, নেত্র = ৩, পঞ্চবাণ = ৫ × ৫ = ২৫। দক্ষিণাগতিতে হয় ১৩২৫। এখানে বামাগতি হইতেই পারে না। কিন্তু 'নবছুঁ নবছুঁ রস' = ৯৯৬, না ৬৬৯? 'শোভনস্তুতি' টীকাকার জয়বিজয়গণি আপনার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,[২]—

শ্রীবিজয়সেনসূরীশ্বরস্য রাজ্যে সুযৌবরাজ্যে তু।
শ্রীবিজয়দেবসূরেরিন্দুরসাব্ধীন্দুমিতবর্ষে॥

এ স্থলে 'ইন্দুরসাব্ধীন্দু' = ১৬৭১, না ১৭৬১? শ্রীযুক্ত হীরালাল রসিকদাস কাপড়িয়া বিশেষ বিচার সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দক্ষিণাগতিক্রমে ১৬৭১ সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

স্পষ্ট নির্দ্দেশ

কোন কোন স্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় যে, অঙ্কপাতে কোন্ গতি অনুসরণ করিতে হইবে। যথা,—

"শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে"

কবি স্পষ্টতঃ বলিয়া দিলেন, দক্ষিণাগতি। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' গ্রন্থে আছে,—

"শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।"

চন্দ্রকলা = ১৬, রাম = ৩, করতল = ২, দক্ষিণাগতিতে উদ্দিষ্ট শক ১৬৩২। অবশ্য বামাগতি যে হইতে পারে না, তাহা প্রচলিত শককাল হইতে বোঝা যায়। তথাপিও কবি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন,—'বাম হল্য বিধিকান্ত···' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন,[৩] "অঙ্কের বামাগতি, এই বিধি। কিন্তু এখানে সে বিধিরূপ কান্ত বাম কি না বক্র হইয়া

১। প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৭৭৪ পৃষ্ঠা।

২। এইটি এবং অপর কতিপয় দৃষ্টান্তের সন্ধান আমি বোম্বাই নগরীবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল রসিকদাস কাপড়িয়ার নিকট পাইয়াছি। তিনি 'শোভনস্তুতি'র এক সংস্করণ মুদ্রিত করিতেছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ সাধারণে প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার অংশবিশেষ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

৩। প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

অনলে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ দক্ষিণাগতি ধরিবে।" হেমচন্দ্র সূরি ধৃত প্রাচীন গাথার শেষ চরণ[১]—

"অংকট্ঠানা পরাহুত্তা"

'পরাহুত্তা' অর্থ 'পরাঙ্‌মুখে' অর্থাৎ 'বিপরীতক্রমে'। সুতরাং ওখানে বামাগতি ধরিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহা বলা উচিত যে, ঐ নির্দ্দেশের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ঐ বৃহৎ রাশিটা ২৯৬ এর সমতুল্য, ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং গণনা দ্বারা নির্ণয় করা যায় যে, কোন্ গতি ধরিতে হইবে। কিন্তু গণনাটা সহজ নহে। তাই গাথাকর্ত্তা পাঠককে সংশয়ে না রাখিয়া স্পষ্ট বলিয়া গেলেন যে, বামাগতি ধরিতে হইবে। সেইরূপ 'নেমিপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত প্রথম বচনটিতে স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ আছে যে, স্থানক্রমে, অর্থাৎ একক, দশক, শতকাদি স্থান যেই ক্রমে বিন্যস্ত আছে, সেই বামাগতিক্রমে অঙ্ক বিন্যাস করিয়া সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে।

অনুমান

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহের বর্ণনাভঙ্গি হইতে এই অনুমান হয় যে, বাঙ্গলা, তথা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত নামসংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি সাধারণ বিধি, দক্ষিণাগতি অসাধারণ বিধি। নতুবা দক্ষিণাগতিক্রমে নামসংখ্যা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্তাকে স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দেশ করিতে হইত না যে, তিনি তাহাই করিয়াছেন। সেইরূপে অনুমান হয় যে, প্রাকৃত সাহিত্যের নামসংখ্যা-প্রণালীতে দক্ষিণাগতি সাধারণ বিধি, বামাগতি অসাধারণ। জিনভদ্রগণির ব্যবহৃত দৃষ্টান্তসমূহ এই অনুমানের অনুকূল হইবে। যদিও তাঁহার রচনাতে নামসংখ্যা-প্রণালীর বহুল উপযোগ হইয়াছে, মাত্র দুই স্থলে ব্যতীত, অপর সর্ব্বত্রই দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাত করিতে হয়। অপর পক্ষে সংস্কৃত-সাহিত্যের জ্যোতিষাদি গ্রন্থে নামসংখ্যা-প্রণালী ব্যবহারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাচীন কাল, অন্ততঃ চতুর্থ খ্রীষ্ট শতক, হইতে পাওয়া গেলেও একমাত্র বক্‌শালী গণিতের একটি স্থল ব্যতীত, অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থে দক্ষিণাগতি অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দশম শতকের নেমিচন্দ্রের প্রযুক্ত দৃষ্টান্তসমূহ কিয়ৎপরিমাণে এই অনুমানের প্রতিকূলতা করিবে। তিনি দক্ষিণাগতির প্রয়োগ বেশী করিলেও বামাগতির প্রয়োগ নেহাৎ কম করেন নাই। আমরা পূর্ব্বে জিনসেনের রচনা হইতে দুইটা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথমটাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় স্থলে নামসংখ্যা-প্রণালী মতে সংখ্যা উল্লেখের পরেই শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি প্রভৃতি স্থাননামের উল্লেখ সহকারে সেই সংখ্যাটি পুনঃ কথিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে যে দক্ষিণাগতি অনুসর্ত্তব্য, তাহাও প্রকারান্তরে নির্দ্দেশিত হইয়া গেল। এইরূপে জিন-

১। এই চরণ সম্বন্ধে পাঠভেদ দেখা যায়। 'পঞ্চসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে ধৃত এই গাথার শেষ চরণের পাঠ, "অংকট্ঠানা ইগুণতীসং" ('অভিধানরাজেন্দ্র', ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আমরা হেমচন্দ্র সূরি ধৃত পাঠই স্বীকার করিয়াছি।

সেনের লেখা হইতে জানা যায় না যে, তাঁহার সময়ে জৈন সাহিত্যে কোন্ গতিক্রমে নামসংখ্যা সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইত। ঐ কালের অপর কোন জৈন গ্রন্থে নামসংখ্যা-প্রণালী ব্যবহার হইয়াছে কি না, আমি জানি না। প্রাকৃত ভাষায় আদিতে কেবল-মাত্র দক্ষিণাগতিই অনুসৃত হইত, পরে হয় ত সংস্কৃতসাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাতে বামাগতিক্রমেও নামসংখ্যা প্রযুক্ত হইতে লাগিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে কি না, দেখিতে হইবে। যাহা হউক, এই বিষয়টা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সুধীবর্গের নিকট অনুরোধ করিতেছি।

নামসংখ্যা-প্রণালীর উৎপত্তি - হেমচন্দ্রের মত

নামসংখ্যা প্রণালীর উৎপত্তির বিশিষ্ট কারণ কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। প্রথম প্রবন্ধে উহার কতকগুলি বিশেষ উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছিল; যথা—ছন্দোবন্ধনসৌকর্য্য, অঙ্কের বিশুদ্ধি রক্ষা, ইত্যাদি। তাহা হইতে অনুমান হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ ঐ সকল কারণে, তাহারো পূর্ব্বে হয় ত বা সাঙ্কেতিক ও অঙ্কগুপ্তি কারণে উহার উৎপত্তি, অন্ততঃ বিস্তৃত প্রচলন হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জৈন লেখক হেমচন্দ্র সূরি ঐ বিষয়ে একটা মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। একটা বৃহৎ রাশির উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি টিপ্পনী করিয়াছেন, "এই রাশিকে কোটি-কোট্যাদি প্রকারে বলিতে কেহই সমর্থ নহেন; তাই এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্কমান সংগ্রহার্থ গাথাদ্বয়ের (উল্লেখ করা হইল)" ।[১] ইহাকে আরো একটু খুলিয়া বলিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিকযুগ হইতে ন্যূনাধিক আঠারটা অঙ্কস্থান সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এবং উহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম বা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃত সাহিত্যের অঙ্কস্থানের নামকরণ-রীতি কথঞ্চিৎ ভিন্ন। জৈন মহাবীরাচার্য্যের (৮৫০ খ্রীষ্ট সাল) 'গণিতসারসংগ্রহে' চব্বিশটা অঙ্কস্থানের উল্লেখ আছে।[২] তাহাদের সকলের পৃথক্ নাম আছে বটে, কিন্তু ঐ নামকরণ-প্রণালীতে মোট পনরটি পৃথক্ সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই হেতু কোন কোন অঙ্কস্থানের নাম অপর দুই স্থানের নামের সমাহারে গঠিত হইয়াছে। যথা,—'দশ সহস্র' (= অযুত), 'দশ লক্ষ' (= নিযুত) ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যের নামকরণ-পদ্ধতি ভিন্ন[৩]। হেমচন্দ্র তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতিতে পাঁচটা পৃথক্ সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়;—একক, দশক, শতক, সহস্র, কোটি। কখন কখন একটা ষষ্ঠ সংজ্ঞাও ধরা হইত,—লক্ষ। ইহাদের বিভিন্ন সমাহার দ্বারা পনরটি অঙ্কস্থানের নাম সাধারণতঃ করা হয়। ততোধিক অঙ্কস্থানের নাম রাখিতে গেলে নামগুলি যে শুধু ভারী হইবে, তাহা নহে; তাহাদের ব্যবহারেও ভ্রম হইবার

১। "অয়ং চ রাশিঃ কোটিকোট্যাদিপ্রকারেণ কেনাপ্যভিধাতুং ন শক্যতে। অতঃ পর্য্যন্তাদারভ্যাঙ্কমান-সংগ্রহার্থং গাথাদ্বয়ং।" অনুযোগদ্বারসূত্র, ১৪২ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। গণিতসারসংগ্রহ, ১। ৬৩-৬৮।

৩। Bibhutibhusan Datta, "The Jaina School of Mathematics," *Bull. Cal Math Soc.*, Vol. 21, 1929, pp. 115—145. বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৩৯—১৪০ পৃষ্ঠা।

সম্ভাবনা থাকে। হেমচন্দ্রের বক্তব্য রাশিটা উনত্রিশ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ দ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না। এই প্রকারে নিরুপায় হইয়াই হেমচন্দ্র সেই রাশির অন্তর্ভুক্ত অঙ্কগুলির নামোল্লেখ ক্রমান্বয়ে করিয়াছেন। ইহা বলা উচিত যে, এই কৌশল তিনি নিজে উদ্ভাবন করেন নাই; উহা বহু প্রাচীন। ঐ গাথাতেই তাহার প্রমাণ আছে। হেমচন্দ্র গাথায় অবলম্বিত কৌশলটা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। উদ্ধৃত গাথা দুইটি যে গাথা-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে আরো সাতটা রাশির বর্ণনা আছে। উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট। সেগুলি অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যেইটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেইটি বিশ অঙ্কস্থান-ব্যাপী। তাহার উল্লেখে গাথাকর্ত্তাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে।—

"লক্খং কোড়াকোড়ি চউরাসীয়ং ভবে সহস্সাইং।
চত্তারি অ সত্তট্ঠা হুংতি সয়া কোড়ীকোড়ীণং॥
চউয়ালং লক্খাইং কোড়ীণং সও চেব য সহস্সা।
তিণ্ণি চ সয়া ৮ সত্তরি কোড়ীণং হুংতি নায়ব্বা॥
পংচাণউই লক্খা এগাবণ্ণং ভবে সহস্সাইং।
ছস্সোলসোত্তরসয়া এসো ছট্ঠেঠা হবই বগ্‌গো॥

বর্ণিত সংখ্যাটি এই—১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৬। এই প্রকারে বেগ ও কষ্ট পাইয়া প্রাচীন গাথাকার এতদপেক্ষাও অনেক বড় সংখ্যাটিকে এই রীতিতে বর্ণনা করিবার প্রচেষ্টা আর করিলেন না। তাহার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিলেন। সেই পদ্ধতিটা যে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ, তাহা বর্ণনা দেখিলেই উপলব্ধি হইবে।

এইরূপে দেখা যায় যে, অতি বৃহৎ রাশি,—এত বৃহৎ যে, অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ সহকারে তাহাদিগকে বলা সহজ নহে, সম্ভবও নহে—বর্ণনা করিবার জন্যই যেন নামসংখ্যা-প্রণালীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাই হেমচন্দ্রের অভিমত। প্রাচীন গাথার বর্ণনাভঙ্গীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি স্বমতকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপর এক জৈন লেখকও সেই কথাই বলিয়াছেন,—"এই রাশি উনত্রিশ অঙ্কস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে বলিয়া কোটিকোট্যাদি প্রকারে তাহাকে বলিতে কেহ সমর্থ নহে। সেই হেতু এক প্রান্তস্থিত অঙ্ক-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অঙ্কস্থানের সংগ্রহ পূর্ব্বপুরুষ প্রণীত গাথাদ্বয় দ্বারা হইল।"[১] যাহা হউক, পরবর্ত্তী কালে বোধ হয়, বিশেষত উপযোগিতার কারণে, ছোট সংখ্যা জ্ঞাপন করিতেও ঐ নূতন পদ্ধতিটা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল। নেমিচন্দ্র লিখিয়াছেন[২]—

১। "অয়ং চ রাশিরেকোনত্রিংশদঙ্কস্থানেন কোটিকোট্যাদিপ্রকারেণাভিধাতুং কথমপি শক্যতে। ততঃ পর্য্যন্তবর্ত্তিনোঽঙ্কস্থানাদারভ্যাঙ্কস্থানসংগ্রহমাত্রং পূর্ব্বপুরুষপ্রণীতেন গাথাদ্বয়েনাভিধীয়তে।" পঞ্চসংগ্রহ (অভিধান-রাজেন্দ্র ধৃত, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩১ পৃষ্ঠা)।

২। ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা।

[ষট্‌চত্বারিংশচ্ছতসপ্তকত্রিপঞ্চাশৎ ভবন্তি মেরুপ্রভৃতীনাম্।
পঞ্চানাং পরিধয়ঃ ক্রমেণ অঙ্কক্রমেণৈব॥]

উদ্দিষ্ট সংখ্যা—৫২৭০৪৬।

"ছাদালসুণ্ণসত্তয়াবাবণ্ণং হোংতি মেরুপহুদীণং।
পংচণং পরিধীত্ত কমেণ অংকক্কমেণেব ॥"

"অঙ্কক্রমে" রাশি বর্ণনাই নামসংখ্যার মূল মর্ম্ম। এই প্রকারে বর্ণনার কারণ বোধ হয় উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা উপরের আলোচনাতে কি কি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় প্রাকৃত সাহিত্যেও নামসংখ্যা-প্রণালী প্রচলিত আছে।

২। বামাগতি ও দক্ষিণাগতি. উভয় ক্রমই প্রাচীন কাল হইতে নামসংখ্যা-প্রণালীতে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

৩। আদিতে সংস্কৃত সাহিত্যে বামাগতি এবং প্রাকৃত সাহিত্যে দক্ষিণাগতি প্রয়োগ সাধারণ ছিল, বোধ হয়।

৪। কোন বৃহৎ রাশিকে সহজে ব্যক্ত করিবার জন্যই বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত নামসংখ্যা পরে সুপ্রণালীবদ্ধ হওয়া সম্ভব।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন*

সর্ব্বজন-পরিচিত পদকল্পতরু গ্রন্থের চতুর্থ শাখার ছাব্বিশ পল্লবে এই কয়টী পদ আছে,—

১

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতিগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাসগুণ শুনইতে বাঢ়ল রাগ॥
দুহুঁ উতকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহিঁ দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁগুণ দুহুঁ জন গায়ত দুহুঁ হিয়ে দুহু রহুঁ জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নামশ্রবণে তহিঁ জানল রূপনরায়ণ গোই॥

২

সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি বটতলে সুরধুনিতীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মীলল পুলক কলেবর গীর॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল দুহুঁক অবশ-প্রতিকার॥ ধ্রু॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ নিভৃতে অলাপই পুছত মধুর-রস কী।
রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত রস হৈতে রসিক কহী॥
রসিকা হইতে রসিক কিয়ে হোয়ত রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি কিয়ে কাহে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুনতহি রূপনরায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ লছিমাপদ করি ধ্যান॥

৩

রসের কারণ রসিকা রসিক কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থূলত পুরুষে কাম সূক্ষ্মগতি স্থূলত প্রকৃতে রতি।
দুহুঁক ঘটনে যে রস হোয়ত এবে তাহা নাহি গতি॥
দুহুঁক ঘোটন বিনহি কখন না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যে কিছু হোয়ত রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ অধিক রস যে পিয়ে।
রতিসুখকালে অধিক সুখহি তা নাকি পুরুষে পায়ে॥

* ১৩৩৭, ৭ই ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দুহুঁক নয়নে নিকসয়ে বাণ বাণ সে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন তবে কৈছে নিকসয়॥
কাম দাবানল রতি যে শীতল সলিল প্রণয়পাত্র।
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয় পচনে পীরিতি মাত্র॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া যবে ভেল দ্রবময়।
সেই যে বস্তু বিলাসে উপজে তাহাকে রস যে কয়॥
ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥

মিলন বর্ণনার পদ এই তিনটী। অতঃপর চণ্ডীদাস ভণিতার আরও কয়েকটী পদ আছে। একটী পদ গুরুতর হেঁয়ালি। এই পদগুলি আমাদের অদ্যকার আলোচ্য নহে।

উপরে উদ্ধৃত ঐ তিনটী পদকে ভিত্তি করিয়া এ দেশে এইরূপ একটা মত প্রচলিত হইয়াছে যে, যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পরস্পরে মিলিয়া এইরূপ আলাপচারী করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি প্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি থাকিলে শিবসিংহকে চাই, অতএব উক্ত রূপনারায়ণ শিবসিংহে রূপান্তরিত হইয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্ গলগণ্ডে বিস্ফোটক,—উদ্ধৃত পদ তিনটী হইতে মিথিলার বিদ্যাপতির একটা নূতন উপাধিই জুটিয়া গিয়াছে—"কবিরঞ্জন"! এই মতের আদি এবং অকৃত্রিম উদ্ভাবয়িতা কে, জানি না। তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

পদ কয়টির ভাবার্থ এই যে, চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি দুই জনে দুই জনের গুণ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন বিদ্যাপতি রূপনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীদাসও রওয়ানা হইলেন—বোধ হয়, সঙ্গে কেহ ছিলেন না। ঠিক একই রাস্তা ধরিয়া দুই জনেই চলিতেছিলেন, রাস্তার মাঝখানে মিলন হইয়া গেল, দুই জনে দুই জনের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচিত হইলেন। রূপনারায়ণ তখন বোধ হয়, আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন পরস্পরের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং দুই জনে ঘন ঘন অবশ হইতে লাগিলেন, তখন রূপনারায়ণ আসিয়া সাম্‌লাইতে লাগিলেন। 'দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার। সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল দুহুঁক অবশ প্রতীকার'। চণ্ডীদাস প্রশ্ন করিলেন, বিদ্যাপতি উত্তর দিলেন; অতঃপর আনন্দে অধীর হইয়া চণ্ডীদাস রূপনারায়ণের সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। ইত্যাদি।

মিলন হইয়াছিল সুরধুনীতীরে, বটতলায়, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়। যাঁহারা মিথিলা এবং নান্নুরের কথা বলেন, তাঁহারা এই সমস্যার মীমাংসা করেন এই বলিয়া যে, বিদ্যাপতি জলপথে নৌকায় আসিতেছিলেন, চণ্ডীদাস সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে আগাইয়া আনিতে গিয়াছিলেন। এক সময় আমরাও এই ভাবেই এই কবিতাগুলির সমাধান করিতাম। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে সাবেক সমস্ত সিদ্ধান্তই বদল করিতে হইয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ সিদ্ধান্ত করেন যে, বিদ্যাপতি পুরীধাম যাইবার

পথে ছাতনায় চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রবাসী পত্রে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

কবিতা পড়িয়া মনে হয়, ইহার রচয়িতা, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই স্বদেশবাসী। বোধ হয়, বিদ্যাপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং তাঁহারই নিকট প্রতিবাসী। প্রথমে বিদ্যাপতিরই যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন,—

"সঙ্গহি রূপ-নরায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল।"

বলেন নাই যে, বিদ্যাপতি আসিতেছেন বা আসিলেন, বলিয়াছেন—"চলিয়া গেলেন"; যেন কবির নিকট হইতে বা তাঁহারই বাসগ্রামের দিক্ হইতে যাত্রা করিলেন। তাহার পর লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস তখন থাকিতে না পারিয়া দর্শনের জন্য চলিলেন। কবিতা পড়িয়া আরও মনে হয়, এ কবিতা মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সময়ে লেখা নহে, ভাষার দিক্ দিয়াও নহে, ভাবের দিক্ দিয়াও নহে। ভাষা যেমন মৈথিল নয়, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বাঙ্গালা নয়, এ রসতত্ত্বও তেমনি বিদ্যাপতির বা চণ্ডীদাসের নয়। কবিতায় যে ভাবে রসিক রসিকা, প্রকৃতি পুরুষ ও পিরীতের তত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহাতে সহজিয়া ভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। এই ধরণের বিলাস, বস্তু, লোভ ইত্যাদি সে কালে ছিল কি না, তর্কের বিষয়।

বিদ্যাপতির পরিচয়

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ সবও বোধ হয়, অবান্তর কথা—এহো বাহ্য। মূল লক্ষ্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। সুতরাং আগে কহিতে হইলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথাই বলিতে হইবে। প্রথমে বিদ্যাপতির কথাই আলোচনা করি—এ বিদ্যাপতি কোন্ বিদ্যাপতি? মিথিলার বিদ্যাপতির ত "কবিরঞ্জন" উপাধি ছিল না। অন্ততঃ মিথিলায় এরূপ কোন জনশ্রুতি নাই, মিথিলার কোন তালপত্রে, কোন পুথিতে, কোন দানপত্রে, এমন কি, সুদূর নেপালেরও কোন গ্রন্থাদিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি বিদ্যাপতির পদ এবং উপাধি সংগ্রহে অনুষ্ঠানের কোন ক্রটি রাখেন নাই, প্রীতির আধিক্যবশতঃ চম্পতি, ভূপতি আদিকেও উপাধির পর্য্যায়ে আনিয়া মিথিলার বিদ্যাপতির স্কন্ধে বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপাইয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মিথিলার পদাবলীতে এই কয়টী উপাধি পাওয়া যায়—কবিকণ্ঠহার, কবিশেখর, দশাবধান, অভিনব-জয়দেব ও পঞ্চানন। * * * * * এই কয়েকটী উপাধি ব্যতীত বঙ্গদেশের বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা মোট সাতটী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে এবং তৎসম্বন্ধে যে কয়েকটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যাপতিকে কবিরঞ্জন বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির একটী প্রসিদ্ধ পদ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী নামক সংগ্রহগ্রন্থে কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়।" (বিদ্যাপতির ভূমিকা, ॥৴০—॥৶০)।

বঙ্গদেশে যে বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়, তিনি যে মিথিলা ভিন্ন অন্য

দেশের হইতে পারেন, নগেনবাবু সে সন্দেহ করেন নাই। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জনের যে সাতটী পদ আছে, নগেনবাবু তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া মাত্র তিনটী পদ তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতি গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আর চারিটি পদ একেবারে পরিষ্কার বাঙ্গালায় লেখা বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথচ কোন মন্তব্য লেখেন নাই। মিথিলার কবি কি করিয়া বাঙ্গালা পদ লিখিলেন, এত বড় একটী সমস্যাও তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জন ভণিতার কয়টী পদই আছে। তার মধ্যে ঐ প্রসিদ্ধ পদটী তিনি কোন্ তালপাতায় পাইয়াছেন, ভূমিকায় বা পদের নীচে পাদটীকায় নগেনবাবু তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই। অপিচ বিদ্যাপতির ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—(ভূমিকায় ১।০) "পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে যে কয়েকটী পদ আছে, তাহার ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং ঘটনা কাল্পনিক বিবেচনা হয়। * * * বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন কবিকল্পনা অনুমান হয়।" ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেল না, ঘটনা কাল্পনিক বিবেচত হইল, মিলন কবিকল্পনা অনুমিত হইল, তথাপি কবিরঞ্জন উপাধিটা থাকিয়া গেল। ঘটনাটা কেবল কাল্পনিকই নয় · কবিকল্পনা; সত্য মাত্র উপাধিটা!

মিথিলার বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি ছিল না বটে, তবে মিলনটা কবিকল্পনা নয়। বাঙ্গালায় একজন বিদ্যাপতি ছিলেন, তাঁর কবিরঞ্জন উপাধি ছিল এবং তাঁহারই সঙ্গে অর্ব্বাচীন একজন চণ্ডীদাসের মিলন ঘটিয়াছিল, কবিতায় সেই কথাই লেখা আছে।

এই বিদ্যাপতির নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীখণ্ডের অপর একজন কবি "রসকল্পবল্লী"-প্রণেতা রামগোপাল দাস "রঘুনন্দনশাখা-নির্ণয়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীতে ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনাপদ করিলেন দড়॥
পদং যথা। শ্যাম গৌরবরণ একদেহ ইত্যাদি॥
গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ।
রূপেষু নিভৃং সিতপঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্বকলানিধানঃ॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥

এই উচ্চ প্রশংসা—ইহার সবটাই কিছু অতিশয়োক্তি নহে। শ্রীখণ্ডে কবিরঞ্জন নামে একজন কবি ছিলেন, বিদ্যাপতি তাঁহার উপাধি ছিল, উপরের কবিতা হইতে এইরূপই অনুমিত হয়। ইনি যে বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত কবিতায় তাহারও ইঙ্গিত আছে। অণিতার গোলমালে ইহাঁর অনেক পদ মিথিলার বিদ্যাপতির নামে চলিয়া

গিয়াছে। ইহাঁর কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলিও অনেকে বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া দিয়াছেন। 'শ্যাম-গৌরবরণ একদেহ' পদটী পদকল্পতরু গ্রন্থে রায় শেখরের (কবিশেখর) ভণিতায় আছে। কিন্তু এখানে পদকল্পতরু অপেক্ষা "শাখানির্ণয়" গ্রন্থের সাক্ষ্য অধিক বিশ্বাস্য। কারণ, রামগোপাল দাস প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আর পদকল্পতরু বোধ হয়, পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সংকলিত হইয়াছিল। বিশেষ রামগোপাল দাস মহাশয় এই পদটীর প্রথম কলি লিখিয়া পদটীকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা পদটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম।

শ্যাম-গৌরবরণ একদেহ। পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ ॥
সৌরভে আগর মুরতি রসসার। পাকল ভেল জম্বু ফল সহকার ॥
গোপজনম পুন দ্বিজ অবতার। নিগম না জানয়ে নিগূঢ় অবতার ॥
প্রকট করিল হরিনাম বাখান। নারি পুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন ॥
শ্রীপুরাচরণকমলমধু পান। সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান ॥

রামগোপাল দাসের পুত্রের নাম পীতাম্বর দাস। রামগোপাল "বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে"—১৫৮৫ শকাব্দায় রসকল্পবল্লী গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। পীতাম্বর তাহারই একাংশের বিস্তৃতি হিসাবে রসমঞ্জরী রচনা করিয়াছিলেন।

রসকল্পবল্লী গ্রন্থ অষ্টম কোরকে।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে ॥
তাহার করচা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন ॥
সেই অষ্ট দলের মঞ্জরী কথোক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি গ্রন্থ জানাইল ॥

এই রসমঞ্জরী-গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভণিতার কয়েকটী পদ পাওয়া যায়। এই কবিরঞ্জন যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। পীতাম্বর বিদ্যাপতি ভণিতার যে পদগুলি তুলিয়াছেন, সেগুলি মিথিলার বিদ্যাপতির। বোধ হয়, এই পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্যই তিনি বিদ্যাপতি ভণিতা দেওয়া শ্রীখণ্ডের কবির কোনও পদ না তুলিয়া, তাঁহার কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলিই তুলিয়াছেন। এক গ্রামে বাড়ী, তার উপর পিতার ঐ প্রশংসা; সুতরাং পীতাম্বর যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের পদই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? আর মিথিলার বিদ্যাপতির যখন কবিরঞ্জন উপাধিই ছিল না, এবং রসমঞ্জরীর পদগুলিও মিথিলায় বা নেপালে পাওয়া যায় নাই, তখন এই অযথা পক্ষপাতিত্বে বিতণ্ডার প্রশ্রয় দিয়া লাভ কি? 'চরণনখ রমণীরঞ্জন ছাঁদ' পদটী ভাল বলিয়াই যে শ্রীখণ্ডের কবির হইতে পারে না, এমন কি কথা আছে? শ্রীখণ্ডেরই রঘুনন্দনের শিষ্য শেখর রায় নামক আর একজন বাঙ্গালী কবির অনেক পদ নগেন বাবু বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে "কাজররুচিহর রয়নি বিশালা", "গগনে অব ঘন মেহ দারুণ সঘন দামিনি ঝলকই" প্রভৃতি পদ নিঃসংশয়িতরূপে রায় শেখরের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এবং এ কথা বলিতে লজ্জা নাই যে, এই সমস্ত

পদ বিদ্যাপতির পদ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। "গগনে অব ঘন" পদটী ত বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদের সঙ্গে তুলিত হইবার যোগ্য।

"সখি রে হমারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর॥"

এই পদ কীর্ত্তনানন্দে এবং অনেক হস্তলিখিত পুথিতে শেখরের ভণিতায় পাওয়া যায়। এ পদ মিথিলায় বা নেপালে পাওয়া যায় নাই। কে জোর করিয়া বলিতে পারেন, এ পদ রায় শেখরের নহে? এক আধটা মৈথিল শব্দ থাকিলেই মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। ব্রজবুলি ত মৈথিল, বাঙ্গালা এবং হিন্দী মিলাইয়া তৈরী একটা কৃত্রিম ভাষা।

পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতার এই কয়টী পদ আছে,—

১। আর কবে হবে মোর শুভখন দিন (বাঙ্গালা)
২। কি কহব রে সখি আজুক বিচার (ব্রজবুলী)
৩। কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ (ঐ)
৪। পুরুষ রতন হেরি মন ভেল ভোর (ঐ)
৫। উদসল কুন্তল ভারা (ঐ)
৬। কি কব রাইয়ের গুণের কথা (বাঙ্গালা)
৭। আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যাওব (,,)

পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ভণিতার নিম্নলিখিত পদগুলি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির রচিত। দুই তিন রকম উপাধি বা নাম থাকিলে অনেক সময় ছন্দের অনুরোধে বা মিলের অনুরোধে ভণিতায় সেগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবির ইচ্ছা অনুসারেও হইয়া থাকে, অন্য কারণও থাকিতে পারে।

১। শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি।—(পদসংখ্যা ২১৫)

খাঁটী বাঙ্গালা পদ; ইহাকে মৈথিল, এমন কি, ব্রজবুলিতেও অনুবাদ করা চলে না।

২। আজি কেনে তোমা এমন দেখি (পদকল্পতরুর পদ-সংখ্যা ২২৬)
৩। একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায় (ঐ ২৩৮)
৪। জটিলা শাশ ফুকারি তঁহি বোলত (ঐ ৩৯৯)
৫। কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি (ঐ ৫১১)
৬। কত কত অনুনয় করু বর নাহ (ঐ ৫১২)
৭। তুঁহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ (ঐ ৫২১)
৮। আছিলুঁ হাম অতি মানিনী হোই (ঐ ৬১২)
৯। বড়ই চতুর মোর কান (ঐ ৬১৩)
১০। কহ কহ সুন্দরি রজনিবিলাস (ঐ ৬৬৬)
১১। তুঁহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর (ঐ ৯১১)

১২। কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয় (ঐ ১৬০৩)
১৩। যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি (ঐ ১৬৮০)
১৪। এ ধনি মানিনি কঠিনপরানী (ঐ ২০৪৬)
১৫। এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি (ঐ ২৫২৫)

পদকল্পতরুর "হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা" ১৬৭২) এই পদের ভণিতায় আছে,—"ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই। কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥" ভণিতায় এই যে দূতীপনা, ইহা কি মিথিলার বিদ্যাপতির? নগেনবাবুর "সখি মোর পিয়া" (৬১৫নং) পদেও ঠিক এইরূপ ভণিতা আছে। নগেনবাবুর "মাধব কি কহব সে বিপরীতে" (পদ ১১০) এই পদের ভণিতা—"কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাষত কাহা চলহ তছু পাশে," ইহা কোন্ বিদ্যাপতির পদ? পদকল্পতরুর—"এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণী" (২০৪৬) এই পদের ভণিতায় পাই,—

"অব যদি না মিলহ মাধব সাথ
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত"

ইহা যদি শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতির না হয়, তাহা হইলে ত নাচার। এই যে পদকর্ত্তার সখীভাব, ইহা ত মিথিলার নয়।

পদকল্পতরুতে ১০৭৮ সংখ্যক পদ "উদসল কুন্তলভারা"—এই পদটী কবিরঞ্জনের ভণিতায় পাই। এই পদ যে কবির লেখা, ২০৭৯ "বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল" বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এই পদটিও সেই কবির লেখা, একই রসের পদ। ভণিতায় আছে,—"বিদ্যাপতিপতি ও রসগাহক", এখানে বিদ্যাপতিপতি যে শিবসিংহ হইতে পারেন না, তাহা সহজবুদ্ধিতে বুঝা যায়। মনিবকে এই ভাবে পতি বলিয়া বিদ্যাপতি কোন পদেই ভণিতা দেন নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইষ্টদেবকে পতি সম্বোধন করিয়াছেন। তুলনা করুন,—"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।"— (নরোত্তম ঠাকুর)। তুলনা করুন—"শ্রীরঘুনন্দন পতি, তাহা বিনু নাহি গতি, যার গুণে ভবভয় নাই।"— (রায়শেখর, পদসংখ্যা ২৩৭২)। সুতরাং এখানে বিদ্যাপতি-পতি বলিতে যে, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরকে বুঝাইতেছে এবং "উদসল কুন্তলভারা" পদের রচয়িতা কবিরঞ্জনই এই বিদ্যাপতি, পদ দুইটির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতি ভণিতার দুইটি পদের ভাব, ভাষা, রস এবং ভণিতায় মিলের পরিচয় দিলাম। এইবার বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জন ভণিতার পদ দুইটি তুলিয়া, এইরূপ ভাব, ভাষা ও রসের ঐক্য দেখাইতেছি। দুইটি পদই পদকল্পতরু হইতে সংগৃহীত।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম। কহয়ে রজনিবিলাসকাম॥
সে যে সুবদনি সুন্দরী রাই। আবেশে হিয়ার মাঝারে লাই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ। রভসে বিহসি মুদ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই। সো সব সপন হোয়ল মোই॥

কিবা সে বচন অমিয়া-মীঠ। ভাঙ্গুর ভঙ্গিম কুটিল দীঠ॥
সে ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে। বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥—(১১০৩)।

কি কব রাইএর গুণের কথা। সব গুণে তারে গড়িল ধাতা॥
এ রাসবিলাস করিল যত। এক মুখে তাহা কহিব কত॥
কিবা সে মধুর নটন গান। অমিয়া অধিক করিলুঁ পান॥
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে। দরশন লাগি পরাণ কান্দে॥
শুনহে পরাণবল্লভ সখা। সে ধনি পুন কি পাইব দেখা॥
নয়নবাণে সে হানল যবে। বিভোর হইয়া রহিনু তবে॥
চুম্বন করল যখন ধনি। অথির তবহুঁ কছু না জানি॥
দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান। বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ॥—(১১০৪)।

সুবলাদি সখা, ললিতাদি সখী এবং জটিলা কুটিলা প্রভৃতির উল্লেখ মিথিলা বা নেপালের কোনও পদে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পদে কিন্তু ইহাঁরা অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রথম পদে সুবলকে যাহা বলা হইল, দ্বিতীয় পদে তাহারই পরের কথা বলা হইয়াছে। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব রাধা-তত্ত্বেরই নিজস্ব কথা। কোনও নায়িকা এ কথা বলিলে প্রাচীন রসশাস্ত্র হইতে তাহাকে চিনিয়া লওয়া কিছুই কঠিন হইত না। কিন্তু এখানে কবি, নায়কের মুখে যে কথাগুলি দিয়াছেন, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সে নায়কের কোনও নাম দেওয়া আছে কি না, সন্দেহ। তাই কবিরঞ্জন নিজেই তাহাকে "বিপরীত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে দিক্ দিয়াই দেখি, পদ দুইটি একজনেরই লেখা এবং তিনি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি। আর একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাপতি-পরিচয়ের উপসংহার করিতেছি। পদটী নগেনবাবুর সম্পাদিত বিদ্যাপতি হইতেই উদ্ধৃত করিলাম।

আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাও।
আর দূর দেশে হাম পিয়া না পাঠাও॥
শীতের ওড়ন পিয়া গিরিষের বা।
বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নিধন বলিয়া পিয়ার না কলুঁ যতন।
এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি॥—(বিদ্যাপতি ৪০০ পৃঃ, ৮২৪ পদ)।

নগেনবাবু পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—"এই পদের ভাষা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির লেখা এই বাঙ্গালা পদটীকে তিনি মৈথিলভাষায় রূপান্তরিত করিতে গিয়া, অবশেষে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চণ্ডীদাস-পরিচয়

কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সঙ্গে যে চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল, তিনি যে নানুরের প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস নহেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য দীন চণ্ডীদাস। ইঁহার রচিত নরোত্তম-বন্দনার পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

জয় নরোত্তম গুণধাম।
দীন দয়াময় অধম দুর্গত পতিতে করুণাবান॥
সখা রামচন্দ্র সনে আলাপন নিশি দিশি রস ভোর।
মো হে ৯ পাতকী তারণ কারণ গুণে ভুবন উজোর॥
নব তাল মান কীর্ত্তন সৃজন প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ।
অতুল ঐশ্বর্য্য লোষ্ট্রের সমান ত্যজনে না সহে ব্যাজ॥
নরোত্তম রে বাপ রে ডাকে ন্যাসিমণি পুন প্রভু আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস কহ কত দিনে পদযুগ হবে লাভ॥

নরোত্তম-শাখা-গণায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়। "জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে। পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥" কোনও কোনও পুথিতে 'মণ্ডিত' স্থলে 'পণ্ডিত' পাঠও আছে। দীনে দয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই স্বাভাবিক গুণ, এ পক্ষে কবি চণ্ডীদাসের বোধ হয়, আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। দীনে অত্যন্ত দয়াবান্ ছিলেন; তাই বোধ হয়, নিজেও "দীন চণ্ডীদাস" এই নাম ব্যবহার করিতেন। স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস' প্রায় ইঁহারই রচিত পদাবলীতে পূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ইঁহার রচিত পদের যে খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাহার অনেক পদের মিল আছে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের প্রথমেই যে পূর্ব্বরাগ ও নবোঢ়ামিলনের বর্ণনা পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি তাহার পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহার রচিত ব্রজবুলির পদও পাওয়া যায়। সিউড়ীর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের লাইব্রেরীতে ২২০৫ সংখ্যক পুথিতে চণ্ডীদাস ভণিতার দুইটি ব্রজবুলির পদ আছে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসেও একটী আছে—"ঘনশ্যামশরীর কলারসধীর যমুনাক তীর বিহার বনি"।—পদসংখ্যা ১৩১। ইনি কবিরঞ্জনের সঙ্গে যে রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে তাহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়।

রূপনারায়ণের পরিচয়

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে পাওয়া গেল। বাকী রহিলেন রূপনারায়ণ। এই রূপনারায়ণ যে মিথিলার শিবসিংহ রূপনারায়ণ নহেন, প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য ছিলেন—পকপল্লীর রাজা নরসিংহ। রূপনারায়ণ তাঁহারই সভাপণ্ডিত। ইনিও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেম-বিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসও শ্রীখণ্ডের অধিবাসী।

তিনি লিখিয়াছেন যে, আসামের এগারসিন্দুর অঞ্চলে রূপনারায়ণের নিবাস ছিল। তিনি নানা স্থানে অধ্যয়নাদি শেষ করিয়া, বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নিকট বিচারে পরাস্ত হন এবং কিছু দিন তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করেন। পরে ঘুরিতে ঘুরিতে পা'কপাড়ায় আসিয়া নরসিংহ রাজার সভাপণ্ডিতের পদে বৃত হন। নিত্যানন্দদাস বলিতেছেন,—

নরোত্তমের গণ রাজা নরসিংহ রায়।
অতি দৃঢ় দেশে পক্বপল্লী বাস হয়॥

"গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতি মনোরম।" গঙ্গাতীরে পক্বপল্লী কোথায়, কেহ সন্ধান করিয়া দিলে বাধিত হইব। রূপনারায়ণকে নিত্যানন্দদাস নিজে দেখিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি যে রূপনারায়ণের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন, প্রেমবিলাসে তাহা লিখিতেও বিস্মৃত হন নাই—

কোন কোন যোগ তাহা হৈতে শিক্ষা কৈল।
যোগগুরু করি আমি তাহারে মানিল॥

এই কবিতা দুই ছত্র হইতে সে সময়ের আর এক দিকের অবস্থাও বেশ পরিষ্কার হইয়া যায় যে, মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে তখন নানা রকম যোগযাগের অনুষ্ঠানাদিও প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি, ইঁহারা সম-সাময়িক এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্দ দিল। দেখিতেছি, ইঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যেও সে সৌহৃদ্যের অসদ্ভাব ছিল না। সুতরাং কবিরঞ্জনের সঙ্গে রূপনারায়ণের সম্প্রীতির কথা কবিকল্পনা নয়। এই রূপনারায়ণ শিবসিংহ হইলে রাজা বা যুবরাজ যে অবস্থাতেই আসুন, তিনি কখনও একাকী আসিতেন না। শিবসিংহের সময়ে নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহেরও সংবাদ পওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, মিথিলার বিদ্যাপতি ও শিবসিংহ কখনও বীরভূমে আসেন নাই এবং তাঁহাদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। কবিরঞ্জনের ও রূপনারায়ণ পণ্ডিতের সঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের মিলন ঘটিয়াছিল।

মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে খেতুরীতে মহোৎসব হয়। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহোৎসবে অনেক কবি ও পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, এবং ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত গ্রন্থে কবি রায়শেখর, কবিরঞ্জন, তরুণীরমণ, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতির নাম না পাওয়ায় মনে হয়, এই উৎসবের পূর্ব্বেই তাঁহারা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। খেতুরীর মহোৎসবের প্রায় ৮০।৯০ বৎসর পরে রসমঞ্জরী সংকলিত হয়। তাহারও ১০০ বৎসর পরে বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরু সংকলন করেন। বৈষ্ণবদাস ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, আমি কীর্ত্তনীয়াদের মুখে শুনিয়া অনেক গান সংগ্রহ করিয়াছি। গীতাম্বর দাসের সময়েই লোকে পদকর্ত্তার নাম ভুলিয়া গিয়াছিল, তিনি রসমঞ্জরীতে কয়েকটা ভণিতাহীন পদ কস্যচিৎ বলিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবদাসের সময় ত আরও গোলমাল হইবার কথা।

গোবিন্দদাস ভণিতা দিয়াছেন,—"রাজা নরসিংহ রূপ নরায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান।"

এই নরসিংহ ও রূপনারায়ণের নাম দিয়া শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন যে পদ লেখেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই সময় পদের ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম জুড়িয়া দেওয়া একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

রায় সন্তোষ, বসন্ত, বল্লভ, হরিনারায়ণ প্রভৃতি অনেকের নাম এই ভাবে জুড়িয়া দেওয়া আছে। পাককূটের (শিখরভূমির) রাজা হরিনারায়ণকে লইয়া নগেনবাবু ত মিথিলায় পাড়ি জমাইয়াছেন। কে জানে, এমনি কেহ নরসিংহকে সরাইয়া শিবসিংহকে বসাইয়া দেন নাই? কবিরাজ গোবিন্দদাস এবং কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি প্রায় সম-সাময়িক, উভয়েই শ্রীখণ্ডের লোক। এখন বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদ দেখিয়া সন্দেহ হইবে, পাদপূরণের কথা হয় ত অনুমানমাত্র। এক শত বৎসরের পরবর্ত্তী লোকে এই যুগ্ম ভণিতার মীমাংসা করিতে না পারিয়া একটা আন্দাজ করিয়া লইয়াছেন। হয় ত এইরূপ ভণিতাও বন্ধুত্বের নিদর্শন, অথবা শ্রদ্ধা নিবেদন। কবি দামোদরের সঙ্গে কবিরঞ্জনের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বাস্তবিক এ সব সমস্যায় পণ্ডিতদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

লছিমা, না ত্রিপুরা?

গোলযোগের এইখানেই শেষ হইল না। মিলনের তিনটী পদের মধ্যে দ্বিতীয় পদের শেষ চরণে আছে,—"কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ লছিমা-পদ করি ধ্যান।" লছিমা থাকিলেই মিথিলাকে রাখিতে হইবে। লছিমাকে লক্ষ্মী করিবার উপায় নাই, ব্রজরসের কথা যে! কিন্তু ত্রিপুরা যে লছিমা হইয়া গিয়াছেন, এত দিন তাহা কাহার নজরে পড়ে নাই। "শ্যাম-গৌরবরণ একদেহ" পদে এই ত্রিপুরার উল্লেখ দেখিয়াছি। আবার এই পদে পাইলাম; আরও কত পদে যে এমনি রূপান্তর ঘটিয়াছে, কে জানে? এখন প্রশ্ন উঠিবে, এই ত্রিপুরা কে? শ্রীখণ্ডে গিয়া এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই নাই। লছিমার ন্যায় ইনিও কি কবির তথাকথিত মানসী ছিলেন? মানবী না হইয়া যদি দেবী হন, তবে ত সমস্যা আরও জটিল হইল। ত্রিপুরা নিশ্চয়ই শাক্তের দেবী, বৈষ্ণবের দেবীর ত্রিপুরা নাম মনে করিতে পারিতেছি না। এই ত্রিপুরার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কিছু নূতন সংবাদ পাইয়াছি। সে কথা বলিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া রাখি।

বৈষ্ণবী দীক্ষায় গুরুমন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে প্রথমেই তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণতঃ ইহা 'হরিনাম গ্রহণ' নামে পরিচিত। এই নামের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা এইরূপ,—"অস্য শ্রীহরিনামমন্ত্রস্য (মতান্তরে শ্রীতারকব্রহ্মনামমন্ত্রস্য) শ্রীবাসুদেবঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীত্রিপুরা দেবতা মম মহাবিদ্যাসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ (ওঁ) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" ইত্যাদি। এইবার "ত্রিপুরাচরণ-কমলমধুপান" স্মরণ করিবার পূর্ব্বে পদের আর একটি কলি স্মরণ করুন,—"প্রকট করিল হরিনাম বাখান"। হরিনামকে মন্ত্র বলিতে হইলে 'ত্রিপুরা'র কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। ত্রিপুরাসুন্দরীর গায়ত্রীর সঙ্গে কামবীজ যুক্ত রহিয়াছে,—"ঐং ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌঃ তন্নো ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ।" ত্রিপুরা দেবীর সঙ্গে বৈষ্ণব-সাধনার কোনও যোগ আছে কি না, রহস্যজ্ঞগণ বলিতে পারেন।

কবিরঞ্জন কি এই ত্রিপুরাদেবীকে উদ্দেশ করিয়াই "ত্রিপুরাচরণ-কমল-মধুপান" লিখিয়াছেন ? দেবী যোগমায়া বৈষ্ণবগণের নিত্য উপাস্যা। সেই ভাবে তারকব্রহ্ম মন্ত্রের দেবতারূপিণী ত্রিপুরাদেবীও উপাস্যা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কামবীজ সাধনের সিদ্ধিদাত্রী এই দেবীকে জানিবার জন্য কোন্ বৈষ্ণব সাধক না ব্যাকুল হইবেন ?

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অন্যান্য নূতন তথ্য

অনুসন্ধানে অপর যাহা কিছু জানিয়াছি, তাহা এই,—বীরভূম জেলায় লুপ লাইনে রেলওয়ে ষ্টেশন বোলপুরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে রূপপুর গ্রাম। এই গ্রামে কবি বিদ্যাপতির সমাধি আছে। গ্রামের ঈশান কোণে 'বড় বাগান' নামে একটি আমবাগান, পূর্ব্বে সেইখানেই রাজবাড়ী ছিল। রাজবাড়ীর দক্ষিণে বিদ্যাপতিপুকুর। ঐ পুষ্করিণী-গর্ভেই কবি সমাধিস্থ হন। পুষ্করিণীটি প্রথম সংস্কারের পর মালিকের জাতি অনুসারে 'পোদ্দার পুকুর' নামে খ্যাত হয়। দ্বিতীয় বার পঙ্কোদ্ধারের পর এখন আবার 'কোঁড়াপুকুর' নামে পরিচিত। কয়েক জন ধাঙ্গড় সম্প্রতি এই পুষ্করিণী দখল করিতেছে। সমাধির ইষ্টকস্তূপাদির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। রাজবাড়ীর উত্তরে খানিকটা পতিত জায়গাকে লোকে 'বিদ্যাপতির ডাঙ্গা' বলিত। এখন সেখানে ধানের জমি হইয়াছে। লোকে বলে—বিদ্যাপতির মাঠ। জমির পরিমাণ ৭৷৷০ বিঘা, জমা ৭৷৷০ টাকা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এই জমি ভোগ করিতেছেন। রাজবাড়ীর ঈশান কোণে প্রায় পোয়াখানেক দূরে উত্তরবাহিনী কাঁদায়ের তীরে শ্মশানে কালীদেবী আছেন ; নাম "অন্ধতুলা কালী"। রাজপুরোহিত আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ এই কালীর সেবাইৎ ছিলেন। ঐ বংশের দৌহিত্র উক্ত মুখোপাধ্যায় এখন সেবাপূজা করেন। গৃহে একটি তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রে দেবীর নিত্য পূজা হয়। কেহ বলেন—ত্রিপুরাযন্ত্র, কেহ বলেন - ভুবনেশ্বরীযন্ত্র। কার্ত্তিকী অমাবস্যায় রাত্রে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে ও যন্ত্রে পূজা করিতে হয়। তৎপরদিন প্রাতে শ্মশানে গিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা দেওয়ার পর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। উভয় স্থানেই ছাগবলির বিধি আছে। পূর্ব্বে যখন বীরভূমে মুসলমান রাজার অধিকার ছিল, সেই সময়কার রাজদত্ত দুইখানি সনন্দে দেবীর নাম পাওয়া যায়। প্রতিলিপি দিলাম।

প্রথম সনন্দ

অন্ধতুলা কালী

পং সেনভোম রূপপুর

শ্রীগঙ্গাধর আচার্য্য জাহির করিলেক নিজ গ্রামে আমাদিগের পৌত্রিক আড়ুল পুষ্কণি ৷৷৹ নয় বিঘা দশ কাঠা লাখেরাজ হরিরামপুর সামীল ৵ মাতার বসতবাটি…পতিত ছয় বিঘা দেবত্তর এই সকল জায়গা সরকারের তালুক মহরতের ত্রিটাতে আমাদের নামে মকুবা হইবেক তহশিল জবদ করিতে চাহে ইহাতে জানান হইল আচার্য্য মজকুর ছাড় পাইবে ১১৩৭ সাল ১১ ফাল্গুন।

দ্বিতীয় সনন্দ

অন্ধকালী

ইং য়ানন্দী হাজরা ষিকদার ও শ্যামদাস কারকুন পং সেনভোম……তাং রূপপুরের যুগল দাঁ ও গোপীমণ্ডল জাহীর করিলেক জে হরিরামপুরে শ্রীশ্রী৺ আছেন সেবা পূজার কারণ নাগাদী সন ১১৬৭ সালের পতিত জমি কৃষ্ণবাটীতে ৫ পাঁচ বিঘা ও তাং রূপপুরের ৫ পাচ বিঘা একুন ১০ দষ বিঘা জমীন দেবত্তর হুকুম হয় তবে আবাদ করিয়া ৺ সেবা পূজা করি ইহার জেমত হুকুম হয় য়তো…এতমাম দরুণ কৃষ্ণবাটীতে ৫ পাঁচ বিঘা ও তাং রূপপুরে ৫ পাঁচ বিঘা একুন ১০ দষ বিঘা জমীন নাগাদী সন ১১৬৭ সালের ৺ সেবাপূজার কারণ দেবত্তর হুকুম করিল নিসাদা করিয়া দিহ আবাদ করিয়া ৺ সেবা পূজা কৃয়া করে ইতি সন ১১৭৫ সাল ১৭ মাঘ।

সূর্য্যের তুলা রাশিতে স্থিতিকাল সাধারণতঃ সৌর কার্ত্তিক নামে পরিচিত। তুলার অমাবস্যায় কালীপূজা অনেক স্থানেই হয়। কিন্তু অন্ধতুলার অর্থ কি? ছাড়পত্রেও লেখা অন্ধতুলা, লোকেও বলে অন্ধতুলা। কি জন্য কালীর এই নামকরণ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।

প্রবাদ আছে, রূপনারায়ণ রাজার নাম অনুসারে রূপপুর গ্রাম। বিদ্যাপতি এই রাজার সভাকবি ছিলেন। অনেকে আবার শিবসিংহের সঙ্গে এই প্রবাদ জড়াইয়া বলিলেন, রূপনারায়ণ শিবসিংহের পুত্র। শিবসিংহের অপর দুই পুত্রের নাম নরনারায়ণ এবং বিজয়নারায়ণ। এই অন্ধতুলা কালী শিবসিংহ বা রূপনারায়ণ রাজার কুলদেবী। গ্রামের পূর্ব্বে 'রাজার পুকুর' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধারকালে একটি বাসুদেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটির পূজা হয়, রূপপুরের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ অধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে; তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহযুগলের সঙ্গে ইনিও পূজা পাইতেছেন। এই মূর্ত্তিও শিবসিংহ বা রূপনারায়ণ রাজার পূজিত বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজরাণী যেখানে ষষ্ঠী পূজা করিতেন, সেই পুষ্করিণীকে লোকে এখনও 'ষাটপুকুর' বলে।

রাজা রাণীর প্রবাদের স্বরূপ নির্ণয় করা শক্ত। হয় ত বিদ্যাপতিকে পাইয়া প্রবাদের রসনায় শিবসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হয় ত এমনও হইতে পারে, পণ্ডিত রূপনারায়ণের এখানে একটী আশ্রম ছিল। তিনি নানারূপ যোগযাগ জানিতেন। শ্রীখণ্ডের নাতিদূরবর্ত্তী পশ্চিমে স্থানটীকে নির্জ্জন দেখিয়া রূপনারায়ণ হয় ত যোগ সাধনের জন্য এখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। কিম্বা রূপনারায়ণকে এই স্থান কেহ ব্রহ্মোত্তর দান করায় বন্ধু বিদ্যাপতিকে লইয়া তিনি এখানে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতেন। অথবা সত্যই রূপনারায়ণ নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি—তিনি শাক্ত ছিলেন, বিদ্যাপতির কবিত্বে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে রূপপুরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে জনশ্রুতির যোগসূত্রে শিবসিংহ আসিয়া জড়িত হইয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ণব অনুমান করেন, এইখানেই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল। উভয় কবি

মিলিয়া বন্ধুর নামে এই স্থানের নাম রাখেন—রূপনারায়ণপুর, সংক্ষেপে এখন রূপপুর হইয়াছে। সুরধুনীতীরে বটতলার কথায় তাঁহারা বলেন, যেখানে বৈষ্ণব, সেইখানেই সুরধুনী। কবি, মিলনের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য সুরধুনীতীরের কথা লিখিয়াছেন, ইহা বলায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন। রূপপুরের প্রবাদ, গ্রামের প্রবীণ অধিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনিলাম। সনন্দ আদি সংগ্রহ কার্য্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাঠক মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

রূপপুরের অদ্ধতুলা বিদ্যাপতির পদে ত্রিপুরা হইয়াছেন কি না, জানি না। তবে দীন চণ্ডীদাসের পদেও মাঝে মাঝে বাসলীর উল্লেখ দেখিয়া ছাতনার কথা মনে হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় প্রভৃতি ছাতনা হইতে একখানা বাসলীমাহাত্ম্যের পুথি বাহির করিয়াছিলেন। পুথিখানি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, যদিও বাঙ্গালা কবিতায় লেখা বাসলীমাহাত্ম্যের পুথির সঙ্গে তাহার মিল নাই, তথাপি তাহার মধ্যে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস, দুই ভাইয়ের নাম আছে বলিয়া কথাটা বলিতেছি। পুথির কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়, দেবীদাসের ভাই চণ্ডীদাস কবি ছিলেন এবং ছাতনায় রাজার আশ্রয়ে তিনি বাস করিতেন। ছাতনার বাসলী দ্বিভুজা, খড়্গখর্পর-ধারিণী, পদতলে অসুর দলন করিতেছেন। দেবীদাস এই দেবীর পূজা করিলেও নাকি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। বিষ্ণুপুরের রাজারা বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ছাতনার রাজারাও এই ধর্ম্মের অনুরক্ত হন। বিষ্ণুপুরের মত বৈষ্ণব না হইলেও তাঁহারা পদাবলী লিখিতেন। এই সে দিনও রাজা লছমীনারায়ণ পদ লিখিয়া গিয়াছেন; সে পুথি আমার নিকট আছে। হইতে পারে, নরোত্তমশিষ্য দীন চণ্ডীদাসের প্রভাবও ইহার অন্যতম কারণ। নান্নুরের বাসলী বাগীশ্বরী, তাঁহার বাম ঊর্দ্ধ হাতে পুস্তক, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হাতে জপমালা, অপর দুইটী হাতে বীণা। ইনিই প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের উপাস্যা ছিলেন। সে চণ্ডীদাস যেমন উপাস্যা দেবীর নামে পদে ভণিতা দিতেন 'বাসলী আদেশে,' ছাতনার চণ্ডীদাসও তেমনি আশ্রয়দাতা রাজার প্রীতি সম্পাদন জন্য ভণিতা দিতেন, 'বাসলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে'। রাজা লছমীনারায়ণ দিব্য সখীভাবে মধুররসের পদ লিখিয়াছেন। এ দিকে সনন্দ দিতে গিয়া প্রথমেই লিখিয়াছেন, 'শ্রীবাশুলীদেবীচরণশরণ' ইত্যাদি। কই, রাধাকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গদেবের নাম ত করেন নাই। ছাতনায় দীন চণ্ডীদাস থাকিলে তাঁহারই সঙ্গে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের মিলন হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শ্রীখণ্ড ও ছাতনার দূরত্ব অল্প হইবে না, সে কালে পথও যথেষ্ট দুর্গম ছিল।

প্রথমে যে পদ তিনটী উদ্ধৃত করিয়াছি, পদকল্পতরুতে ঐ তিনটী পদ ছাড়া আরও একটী পদ ঐ পরিচ্ছেদেই আছে—ঐ পদ তিনটীর পূর্ব্বেই আছে। তাহাতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সহচরগণের নাম আছে—রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ এবং শিবসিংহ। পদে আছে—"নিজ নিজ সহচর রসিক ভকতবর তা সনে কতর বিচার"। তাহার পরেই এই নামগুলি আছে। ইহারা সকলেই যদি মিথিলার লোক হন এবং বিদ্যাপতির পক্ষের লোক হন, তবে নিজ নিজ সহচর বলার সার্থকতা কি? আর এক

পক্ষের লোকের নামাবলী লিখিবারই বা কারণ কি? বিদ্যাপতির সঙ্গে গেলেন—"কেবল রূপনারায়ণ"। তবে ইহাঁরা কে এবং কেন ইহাঁদের নাম কবিতায় স্থান পাইল? এ সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই। রূপনারায়ণ বিজয়নারায়ণ যদি বিদ্যাপতির দলে থাকেন, তবে বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহকে চণ্ডীদাসের দলে রাখিতে হয়। অথবা প্রথমোক্ত দুই জনকে বিদ্যাপতির দলে রাখিয়া, শেষের দুই জনকে চণ্ডীদাসের দলে দিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কোন সামঞ্জস্য হয় না। বাস্তবিক এ কবিতাটী গোঁজামিল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেক দিনের ঘটনা, কবিতা-লেখকের স্মরণে না থাকা স্বাভাবিক। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ সমস্ত বিষয়টী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' সম্বন্ধে বক্তব্য

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, বীরভূম প্রদেশেও 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী কবিরঞ্জন নামক পদকর্ত্তার উদ্ভব হইয়াছিল। তথায় প্রবাদ আছে যে, এই 'বিদ্যাপতি' উপাধি-ধারী কবিরঞ্জনই 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাঙ্গালা পদসমূহের এবং 'চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন-ছান্দ' ইত্যাদি ইত্যাদি কোন কোন ব্রজবুলী পদের রচয়িতা। এরূপও নাকি প্রবাদ যে, এই বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জনের সহিতই গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাসের মিলন ও রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণবাবু রামগোপাল দাসকৃত 'রঘুনন্দ-শাখা-নির্ণয়' নামক অপ্রকাশিত পুথিতে নিম্ন-লিখিত উক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। যথা,—

"কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা-পদ করিলেন দড়॥

পদং যথা—

"শ্যাম গৌর বরণ এক দেহ" ইত্যাদি।
গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি-কালিদাসঃ।
রূপেষু নিভর্ৎসিত-পঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব-কলা-প্রবীণঃ॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে দুর্গতি॥"

এই বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, ইহাঁর নাম 'রঞ্জন' বা 'কবিরঞ্জন' ছিল; 'বিদ্যাপতি' ছিল 'ইহাঁর উপাধি। ইনি কখনও 'কবিরঞ্জন' ও কখনও বিদ্যাপতি' ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনন্দন শ্রীমহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এই কবিরঞ্জনের সহিত মহাপ্রভুরও আন্দাজ এক শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বড়ু চণ্ডীদাসের সম্মিলন ঘটিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এ জন্যই হরেকৃষ্ণবাবু অনুমান করেন যে, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা নরোত্তম ঠাকুরের ভক্ত দীন চণ্ডীদাসের সহিত সম্ভবতঃ এই কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সম্মিলন ঘটিয়া থাকিবে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলনের কাহিনী অসম্ভব, সুতরাং অবিশ্বাস্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সেই মিলন-কাহিনী অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য মনে না করিলেও, তিনি বড়ুচণ্ডীদাসের উক্ত কাব্যে তাঁহার সহজিয়া ভাবের কোন পরিচয় পান নাই। পক্ষান্তরে দীন চণ্ডীদাস যে একজন সহজিয়া ভাবাপন্ন পদকর্ত্তা ছিলেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত বড়ুচণ্ডীদাসের গঙ্গাতীরে সম্মিলন ও সহজিয়া রস-তত্ত্বের আলোচনার যথার্থতার সম্বন্ধে সন্দেহের বিশিষ্ট কারণ আছে। হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত পরবর্ত্তী বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে সে সন্দেহের অবকাশ নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তীর বিরুদ্ধে পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬শ পল্লবের অন্তর্গত কয়েকটী পদে দলিল-প্রমাণ রহিয়াছে। ২৬শ পল্লবের ২৩৮৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

রূপ নরায়ণ বিজয় নরায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি দুহুঁক করু বর্ণন
তছু পদ-কমলক ভৃঙ্গ ॥

২৩৯১ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

"পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥"

বিদ্যাপতি যদি রঘুনন্দন-ভক্ত কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি হইবেন, তাহা হইলে উদ্ধৃত ভণিতায় 'রূপনরায়ণ', 'বিজয়নরায়ণ' ও 'শিবসিংহ'—মৈথিল রাজগণের ও 'লছিমা' দেবীরপ্রসঙ্গ আসিল কি প্রকারে? এই পদগুলিকে অমূলক ও কৃত্রিম মনে করিবার কোনও কারণ আছে কি? এই প্রাচীন পদগুলি—যাহা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণবদাসের মত একজন পণ্ডিত ও গবেষক দ্বারা বহু চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়া পদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে—শুধু লোকের মুখে প্রচারিত কিংবদন্তী বা কল্পনার বলে অগ্রাহ্য করা যায় কি?; আশা করি, হরেকৃষ্ণ বাবু এই বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

হরেকৃষ্ণ বাবু আরও লিখিয়াছেন,—"কবিরঞ্জন ভণিতার যত পদ পদকল্পতরুতে আছে,

সব এই কবির। কোনটাই বিদ্যাপতির নয়। বাঙ্গালা-পদ কিরূপে বিদ্যাপতির হইবে?

* * * *

ঐ যে 'উদসল কুন্তল-ভারা'—এ পদের ভাষা যাহাই হউক, পদটী শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের। একই পুথিতে কবিরঞ্জন ভণিতার পদ ভাগাভাগি হইবে না। কারণ, বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি ছিল কি না, সন্দেহজনক।

"রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদ—"চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন ছান্দ,—এই পদ এই কবিরঞ্জনের। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর রসমঞ্জরীতে পিতার প্রশংসিত এই কবির পদই তুলিয়াছেন। ঐ পদে 'কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি। প্রেম অমিয়া-রসে লুবধ মুবারি॥' এই ভণিতাই ঠিক।"

"একই পুথিতে কবিরঞ্জন ভণিতার পদ ভাগাভাগি হইবে না"—আমরা হরেকৃষ্ণবাবুর এই কথার কোন যুক্তি বুঝিলাম না। পদকল্পতরু গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভণিতার ৭টী ব্রজবুলী পদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা কবিরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের বিষয় অবগত না থাকায়, ঐ পদগুলির সমস্তই বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছি (ভূমিকায় ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। হরেকৃষ্ণবাবু পদকল্পতরুর ৪৫২ সংখ্যক "চরণ-নখ রমণি-রঞ্জনছান্দ" ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত পদে রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জনের ভণিতা দেখিয়া, উহা খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচিত বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। পদকল্পতরুর কোন পুথিতেই ঐ পদে কবিরঞ্জনের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। এ পদটায় রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জন ভণিতা থাকিলেও সেই কবিরঞ্জন যে খণ্ডবাসী কবিরঞ্জন ছাড়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতি হইতে পারেন না, সে সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণবাবু কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। এ পদটার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতার যে ৭টী পদ আছে, তাহা হরেকৃষ্ণ বাবু রসমঞ্জরীতে পাইয়াছেন কি? যদি না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোন্ প্রমাণের বা অনুমানের বলে সেগুলিকে খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচিত মনে করেন?

পদকল্পতরুর পূর্ব্বোক্ত ২৩৮৮ ও ২৩৯৩ সংখ্যক পদ দেখিয়াও হরেকৃষ্ণ বাবু কি জন্য মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন নামে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। কবিরঞ্জন ভণিতার অন্ততঃ উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর ৫টী পদের রচয়িতাও যে তিনি ছাড়া অন্য কেহ নহেন—এরূপ একটা অপ্রামাণিক ব্যাপক উক্তির আমরা সমর্থন করিতে পারি না। 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাঙ্গালা পদগুলির রচনা সাধারণ; উহাতে কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতির রচনার লক্ষণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদগুলির মধ্যে ১০৪ ও ১৭৬০ সংখ্যক বাঙ্গালা পদদ্বয় ব্যতীত বাকি ৫টী ব্রজবুলীর পদ বিদ্যাপতির কবিতার সৌসাদৃশ্যযুক্ত। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে সুধীমাংসার পক্ষে হরেকৃষ্ণবাবুর মত "পদের ভাষা যাহাই হউক" বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারি না। আমরা পদকল্পতরুর কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলির পুনরালোচনা করিয়া দৃঢ়তা সহকারেই বলিতে ইচ্ছা করি

যে, ভাষা-গত ও ভাব গত প্রমাণ অনুসারে ১১০৪ ও ১৭৬০ সংখ্যক পদদ্বয় ছাড়া বাকী পদগুলি কবিরঞ্জন উপাধিধারী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই প্রতীত হয়। বাঙ্গালা পদদ্বয় খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একই পুথিতে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদে বৈষ্ণবদাস ভাগাভাগি করিয়াছেন এবং মৈথিল কবিরঞ্জনের পার্শ্বে বাঙ্গালী কবিরঞ্জনকে স্থান দিয়া তিনি সুবিবেচনা ও নিরপেক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন। হরেকৃষ্ণবাবুর মতের সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, বিদ্যাপতি ভণিতার বাঙ্গালা পদগুলির রচয়িতা উড়িষ্যাবাসী চম্পতি না হইয়া, খণ্ডবাসী বিদ্যাপতি হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। আমরা হরেকৃষ্ণবাবুর এই প্রশংসনীয় গবেষণার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুর আলোচ্য প্রবন্ধ না দেখিয়া উহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে এখানে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রীয়ারসন্ সাহেব মহোদয় বঙ্গীয় সংস্করণের 'বিদ্যাপতি'-ভণিতার অধিকাংশ পদ নকল বিদ্যাপতি (Pseudo-Vidyapati) কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনিও এক স্থলে পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২৬শ পল্লবের পূর্ব্বোক্ত ২৩২৩ সংখ্যক 'বিদ্যাপতি'-ভনিতার পদের অকৃত্রিমতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ পদটিকে অমূলক ও কৃত্রিম বলিয়া উড়াইয়া না দিতে পারিলে, 'কবিরঞ্জন' যে মৈথিল বিদ্যাপতির অন্যতম নামান্তর বা উপাধি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এতদ্ভিন্ন 'কবিরঞ্জন' ভণিতার ১০৭৮ সংখ্যক পূর্ব্বোক্ত "উদসল কুন্তল ভারা" ইত্যাদি পদের "প্রিয়তম কর তহি দেবা। সরসিজ মাঝে জনু রহল চকেবা॥" শ্লোকটীর ভাষাই উহার রচয়িতার মৈথিলত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। ঐ শ্লোকের 'দেবা' শব্দটী মৈথিল ব্যাকরণ অনুসারে—"দেব" Act of giving অর্থে নিষ্পন্ন হইয়াছে।* বাঙ্গালায় এরূপ প্রয়োগ না থাকায় স্বয়ং রাধামোহন ঠাকুর উহাকে সংস্কৃতের ক্রীড়ার্থক 'দিব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন মনে করিয়া 'ক্রীড়ন' অর্থ লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উহা 'অর্পণ' অর্থে 'দা' ধাতুর পদ বটে। অর্থ—Act of giving বা অর্পণ। ক্রীড়ন অর্থে সংস্কৃতে 'দেবন' বা 'দেব' পদ সিদ্ধ হইতে পারিলেও, মৈথিল বা বাঙ্গালায় সেরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না; সেরূপ অর্থও এখানে খুব সঙ্গত নহে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর ভূমিকার ১।/০ পৃষ্ঠার কৌতুকজনক সেই সুন্দর শিক্ষাপূর্ণ গল্পের বর্ণিত বহুমূল্য হারের সাঙ্কেতিক কল্ খোলা হইতেই যেমন উহার প্রকৃত মালিকের পরিচয় হইয়াছিল, এখানেও তেমনি 'দেবা' শব্দের অনন্য-ভাষা-সাধারণ 'অর্পণ' অর্থে একান্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর প্রয়োগ দ্বারা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, আলোচ্য শ্লোকের ভাষা খাঁটি মৈথিলী। তবে স্বয়ং রাধামোহন ঠাকুরের ন্যায় সুপণ্ডিত পদকর্ত্তা যে, 'দেবা' শব্দের অর্থ করিতে ভ্রান্ত হইয়াছেন, শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের মৈথিল ভাষায়

*গ্রীয়ারসন মহোদয়ের A Chrestomathy of the Maithili Languageনামক গ্রন্থের Vocabulary দ্রষ্টব্য।

অসামান্য অভিজ্ঞতা হেতু তিনি সেই বিদেশী ভাষায়ই এরূপ পদ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যদি কেহ এরূপ তর্ক তোলেন, তাহা হইলে আমরা কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন যে কেবল বাঙ্গালা ও তথাকথিত ব্রজবুলিতে নহে—খাঁটী মৈথিল রীতিসিদ্ধ ভাষায় পদ-রচনা করিতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, এরূপ পদকে মৈথিল কবির রচনা বলিয়াই স্বীকার করিব। বলা বাহুল্য যে কবিরঞ্জন ভণিতার এ রকম একটা পদও যদি মৈথিল কবির রচিত বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে ২৩৯৩ সংখ্যক পদের উল্লিখিত কবিরঞ্জন যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ উপাধি-বিশেষ, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

বড়ু চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির রচিত সহজিয়া ভাবের খাঁটি পদ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই সত্য; কিন্তু উহা হইতেই তাঁহারা সহজিয়া মতাবলম্বী ছিলেন না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। "আপন ভজনকথা না কহিবে যথা তথা" এই স্বাভাবিক ও সমীচীন যুক্তি অনুসারে তাঁহারা সহজিয়া ভাবের কোন পদ রচনা না করিয়া থাকিলেও কিংবদন্তী মূলে পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের নাম দিয়া এ সকল পদ রচিত হইতে কি বাধা আছে? বস্তুতঃ হরেকৃষ্ণবাবুর মত অনুসারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে যে সম্মিলন ঘটিয়াছিল, উহা প্রকৃত পক্ষে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের মধ্যে সংঘটিত মিলন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, ঐ বিবরণ যে, কেবল পদকল্পতরুর পূর্ব্বোক্ত পদাবলীর প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে; উহা অনেক পরিমাণে একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে কেন না, তর্ক স্থলে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিকে দীন চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী এবং পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের আন্দাজ এক শত কি সোয়া শত বৎসরের আগের লোক বলিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্ঘটিত সম্মিলনে সেরূপ কোন অসাধারণ বিশেষত্ব না থাকায় উহার সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচারিত হওয়া এবং এত অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকৃত ঘটনার বিবরণে এরূপ বিকৃতি ঘটিয়া মাত্র এক শত, কি সোয়া শত বৎসরের পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের মনেও সেই মিলন সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা কোন মতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। যেখানে প্রচলিত প্রাচীন মতে সেরূপ কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না, সেখানে নানারূপে অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত একটা নূতন মত খাড়া করিতে যাওয়া নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। শ্রীখণ্ড হইতে কিছু দিন পূর্ব্বে "রঘুনন্দনশাখা-নির্ণয়" নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে, উহার সাহায্যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় উহা বিদ্যাপতির রচিত কতকগুলি অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত করিয়া হরেকৃষ্ণবাবু আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এ জন্য ধন্যবাদের পাত্র হইলেও সত্যের অনুরোধে দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, উল্লিখিত নানা কারণেই আমরা তাঁহার এই অভিনব মতের প্রতিবাদ না করিয়া পারিতেছি না।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তব্য

পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্-এ মহাশয় যখন পদকল্পতরুর ভূমিকা লিখিতেছিলেন, সেই সময় দুই এক জন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সে সম্বন্ধে আমার মতামত তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দীন চণ্ডীদাস ও কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির কথা ছিল। আমি লিখিয়াছিলাম যে, পদকল্পতরু গ্রন্থে যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলনের পদ আছে তাহা দীন চণ্ডীদাস কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির মিলনের পদ—প্রসিদ্ধ বড়ু চণ্ডীদাস ও মিথিলার বিদ্যাপতির নহে। রায় মহাশয় আমার এ মত গ্রহণ করেন নাই। পদকল্পতরুর ভূমিকায় তিনি এ মতের প্রতিবাদে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রধান কথা, পদের ভাষা মৈথিল। "উদসল কুম্ভলভারা" পদের "প্রিয়তম কর তহিঁ দেবা" এই যে, 'দেবা' অর্থে অর্পণ, ইহা বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের মতে এ প্রমাণ ঘাতসহ নহে। কারণ বাঙ্গালায় যদিই না থাকে হিন্দীতে প্রচুর আছে। এ জন্য মিথিলায় ছুটাছুটীর দরকার হইবে না। একটা উদাহরণ দিতেছি।

তুলসীদাস-কৃত রামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড, কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার সংস্করণ ১০১ দোহার পরে ২১১ পৃষ্ঠায় আছে,—

অব কছু নাথ ন চাহিয় মোরে।
দীন দয়াল অনুগ্রহ তোরে॥
ফিরতী বার মোহি জোই দেবা।
সো প্রসাদ মৈ সির ধরি লেবা॥

দেবা = অন্তঃস্থ ব, উচ্চারণে বাঙ্গালার "ওয়া"। "উদসল কুম্ভলভারা" "পদের দেবাতেও অন্তঃস্থ ব, অর্থ একই রূপ। উপরি উক্ত দোহার তৃতীয় ও চতুর্থ কলির অর্থ "আবার যা দিলে, সেই প্রসাদ শিরে ধরিয়া নিলাম।" ব্রজবুলির পদে এরূপ প্রয়োগ থাকিলে তাহাকে মিথিলায় লইবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত। আমরা ভাষাতত্ত্ব জানি না, কিন্তু মৈথিলে এরূপ প্রয়োগ কত জায়গায় আছে, দুই একটা উদাহরণ পাইলে পণ্ডিতদের বুঝিবার সুবিহইত।

রায় মহাশয় 'উদসল কুম্ভলভারা' পদের টীকায় "কুচকুম্ভ পালটল বয়না" প্রভৃতি কলির অর্থ লিখিয়াছেন,—"কুচকুম্ভ ও বদন বিবর্ত্তিত হইল। মদন কুচরূপ কুম্ভ দ্বারা অমৃত রস ঢালিল। প্রিয়তমের কর তাহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, যেন সরসিজযুগলের মাঝে চক্রবাকযুগল রহিয়াছে।" প, ক, ত, ৩য় শাখা ১৫শ পল্লব ২৩৫ পৃঃ।

আমাদের মতে "কুচকুম্ভ ও বদন" অর্থ ঠিক নহে। বোধ হয় এইরূপ অর্থ হইবে—(বৈপরীত্য হেতু) কুচকুম্ভ নিম্নমুখ হইল, যেন মদন অমৃত রস ঢালিল। (প্লাবনের আশঙ্কায় কুম্ভের মুখ আচ্ছাদন জন্য) প্রিয়তম তাহাতে কর দিলেন, যেন পদ্মের মাঝে চক্রবাক রহিল।

দ্বিতীয় কথা, রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ, শিবসিংহ। জিজ্ঞাসা করি, মিথিলার এই সব রাজাদের নাম কবিদ্বয়ের মিলনের মধ্যে আসে কোথা হইতে? এই ত দেখিলাম, শিবসিংহ অর্থাৎ মাত্র রূপনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাপতি চলিয়া

আসিয়াছেন। এখানে দেখিতেছি, রূপনারায়ণ ও শিবসিংহ পৃথক্ ব্যক্তি। তারপর বৈদ্যনাথ ও বিজয়নারায়ণ কে? ইহাদের মধ্যে কার পদকমলের ভৃঙ্গ কে এই মিলন বর্ণনা করিতেছেন? গোবিন্দদাসের পদে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ আছেন, ইহারাও কি মিথিলার? ত্রিপুরা যে লছিমা হইয়াছেন, তাহা মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

রায় মহাশয় পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিলেন না। গোপাল দাসের রসকল্পবল্লীর মধ্যেও 'চরণ-নখ রমণী-রঞ্জন ছান্দ' পদটী কবিরঞ্জন ঠাকুরের বলিয়া লিখিত আছে। শ্রীখণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে দামোদর কবিবর, চিরঞ্জীব ও সুলোচনের সঙ্গে তিনি কবিরঞ্জনের নাম করিয়াছেন। পৌণে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত রসকল্পবল্লী ও রসমঞ্জরীর প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার শত বৎসর পরে সংকলিত পদকল্পতরুর প্রমাণ বলবৎ মনে করা নিতান্তই জেদের কাজ। আগে প্রমাণিত করিতে হইবে যে, মিথিলার বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' উপাধি ছিল, তার পরে অন্য কথা।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—এস, কে, দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সভাপতির অভিভাষণ*

আমি এবার আসিয়াছি আপনাদের নিকট শেষ বিদায় লইতে। আমার সভাপতির কাজের ৫ বৎসর পূর্ণ হইল। আপনাদের নিয়মানুসারেই আমাকে যাইতেই হইবে, কিন্তু আমি দুই তিন বার গিয়া গিয়াও যাই নাই, সেই জন্য এইবার বলিতেছি—শেষ বিদায়।

তিন কারণে আমায় শেষ বিদায় লইতে হইতেছে।

১। আমি তিন খেপে ১৩ বৎসর আপনাদের সভাপতির কাজ করিয়াছি। এত দীর্ঘকাল সভাপতির কাজ করা ঠিক উচিত হয় নাই। ইহাতে অনেকের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পথে, বোধ হয়, বাধা দিয়াছি; কিন্তু সে জন্য আপনারাই দায়ী।

২। আমার বয়স অনেক হইয়াছে। এ বয়সে কোন কাজের ভার মাথায় রাখা ঠিক উচিত নয়।

৩। দুই বৎসর হইল, আমার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমি একরূপ চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়াছি। পরিষৎ মন্দিরে আমার যতবার আসা উচিত, তাহার শতাংশের এক অংশও আসিতে পারি না। গত বৎসর আমি ছাড়িতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আপনারা দেন নাই। তাই বলিতেছি, এই তিন কারণে আমার শেষ বিদায়। আমি শেষ বিদায় লইতেই আসিয়াছি, নহিলে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিবার কোন দরকার ছিল না।

এই যে ১৩ বৎসর আমি এখানে সভাপতির কাজ করিয়াছি, ইহাতে আমার কোনই স্বার্থ ছিল না—ইহাতে আমি টাকাকড়িও পাই নাই, আমার পদ-প্রতিপত্তিও বাড়ে নাই। এই ১৩ বৎসরের মধ্যে আমি অনেকবার লাঞ্ছিত, অবমানিত এবং বিতাড়িতও হইয়াছি, এবং অনেকবার পূজিত, অভিনন্দিত এবং সংবর্দ্ধিতও হইয়াছি; কিন্তু সকল সময়ে সমান ভাবেই আমি সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছি, কোন সময়েই ইহার প্রতি আমার আস্থা একটুও কমে নাই। ইহার কারণ কি জানেন? আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী ইংরাজি শিখিয়া যত কাজ করিয়াছে, সে সকলই ভাল-মন্দ-জড়িত। দেশের মধ্যে সাহেবিয়ানা ঢোকান্ অনেক কাজেরই উদ্দেশ্য। শিক্ষিত লোকে যাহাকে সংস্কার বলে, বাজে লোকে তাহাকে ছারখার বলে—যত কাজ হইয়াছে, সকলেরই দুই রকম ব্যাখ্যা আছে। একটা ব্যাখ্যা ইংরাজিওয়ালাদের—সেটা ভাল, আর একটা ব্যাখ্যা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-ওয়ালাদের—সেটা মন্দ; কিন্তু বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে দুই রকম ব্যাখ্যা নাই এবং হইতেও পারে না। ইহা যদিও ইংরাজিওয়ালারাই স্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে দুই রকম ব্যাখ্যা নাই। ইহা খাঁটি বাঙ্গালার খাঁটি মঙ্গলের জন্য জন্মিয়াছে এবং খাঁটি বাঙ্গালার খাঁটি মঙ্গল করিতেছে। সকল বাঙ্গালীরই ইহাতে যোগ দেওয়া উচিত এবং

* ১৩২৭।৩২এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষড়্‌বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

দিতেছেনও অনেকে—ইংরাজিওয়ালাও দিতেছেন, সংস্কৃতওয়ালাও দিতেছেন, আরবী-পারসীওয়ালাও দিতেছেন। এখানে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, আচরণীয় অনাচরণীয় ভেদ নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ নাই। ইহার উদ্দেশ্য, বাঙ্গালার সীমার মধ্যে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে, সেইগুলি বাহির করা এবং তাহার একটা উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়া, —ইহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না—এরূপ খাঁটি মঙ্গলময় ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলেও সেটা আমি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। আপনারা যদি ধর্ম্ম অধর্ম্ম না মানেন, আমি সেটা পুণ্য বলিয়া মনে করি, আপনারা যদি পাপপুণ্য না মানেন, আমি সেটা ভাগ্য বলিয়া মনে করি—আপনারা মানুন আর নাই মানুন, আমি ইহাকে ধর্ম্ম, পুণ্য ও ভাগ্য, এই তিন বলিয়াই মানি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি এরূপ পুণ্যময় অনুষ্ঠানের সহিত এত দীর্ঘকাল জড়িত ছিলাম।

এখন সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধে আমার বলিবার গোটাকয়েক কথা আছে। প্রথম—সাহিত্য-পরিষদের টাকাকড়ি সম্বন্ধে, দ্বিতীয়—সাহিত্য-পরিষদের কাজ সম্বন্ধে।

সাহিত্য-পরিষদের টাকাকড়ি সম্বন্ধে অবস্থা ভাল নয়। আমি যখন প্রথম সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হই, তখন অবস্থা আরও খারাপ ছিল। গচ্ছিত তহবিলগুলি সব প্রায় সংসার-খরচে গিয়াছে। যে সকল কাজের জন্য গচ্ছিত ছিল, সে সকল কাজ হইতেছে না। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরটি পড়-পড়, রমেশ-ভবনের বাড়ীটি তৈয়ার হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ধার শোধ হয় নাই। যাহাই হউক, সাহিত্য-পরিষদের মুরুব্বিরা কয়েক বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া গচ্ছিত তহবিল প্রায় শোধ করিয়াছেন, বাড়ীটিও এমন ভাবে মেরামত করা হইয়াছে যে, ২০ বৎসর আর উহাতে হাত দিতে হইবে না। রমেশ-ভবনের কণ্ট্রাক্টারদের টাকা শোধের ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই সকল কাজের জন্য আমরা অনেকের কাছে বিশেষ বাধিত হইয়াছি। প্রথম—কলিকাতা করপোরেশন ও তাহার সজ্জনচূড়ামণি মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দ্বিতীয়—লর্ড লিটন ও তাঁহার মন্ত্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, তৃতীয়—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ইঞ্জিনিয়ার, ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আমাদের মেরামতি কাজ দেখিয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে বাড়ীটি অধিক দিন টিকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যদিও সাহিত্য-পরিষদের এই সকল উন্নতি হইয়াছে, তথাপি ইহার টাকাকড়ির অবস্থা ভাল নয়। সদস্যদের চাঁদায় যে টাকা আয় হয়, তাহাতে পরিষদের সংসার-খরচ কুলায় না। প্রতিবৎসরই ঢাকে ও ঢোলে দেনা করিতে হয়, সে দেনাও সব সময়ে শোধ যায় না। ইহার এক উপায় সদস্য বাড়ান। সদস্য বাড়ানর একমাত্র উপায়, যাহা আপনারা সময়ে সময়ে করেন, সেটা হচ্ছে ধরাপাকড়া, উপরোধে ঢেঁকি গেলান। যাঁহারা এইরূপে সদস্য হন, তাঁহারা প্রায়ই শীঘ্র ছাড়িয়া দেন অথবা চাঁদা না দেওয়ার দরুণ তাঁহাদের নাম কাটা যায়। ধরাপাকড়া কতকটা না করিলেও চলে না এবং কতকটা করিতেও হইবে; কিন্তু আসল কথা, পরিষদের দিকে লোকের যাহাতে টান হয়, তাহা করিতে হইবে, পরিষদের নাম যাহাতে জাহির হয়, তাহা করিতে হইবে। টান হইবার এক উপায়, পত্রিকাখানিকে এমন ভাবে

লিখিতে হইবে, যাহাতে অন্ততঃ ২।৩টিও প্রবন্ধ পড়িয়া সাধারণ লোকে সহজে বুঝিতে পারে। পত্রিকার প্রবন্ধগুলি প্রায়ই সব পণ্ডিতের জন্য লেখা, পাদটীকা ও উদ্ধৃত অংশের টীকায় পরিপূর্ণ, সাধারণ পাঠকে পড়িতে পারে না—তাহাদের জন্য গল্পের মত করিয়া লেখা উচিত, তাই বলিয়া নভেল ও গল্প দিয়া পূরাইতে বলিতেছি না। পত্রিকা যদি মুখরোচক হয়, তাহা হইলে অনেকে সদস্য হইতে চাহিবেন, নহিলে চাহিবেন না। সময়ে সময়ে পরিষদে উৎসবাদির দরকার এবং সেই সব উৎসবে বাহিরের লোক নিমন্ত্রণ করা দরকার। পরিষদের জন্মতিথি উপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে যে উৎসব হইবার কথা হইয়াছে, তাহা খুব ভালই হইয়াছে। সাম্বৎসরিক অধিবেশনেও একটি উৎসব হইলে ভাল হয়। অন্ততঃ সেই বৎসরে যে সকল মূর্ত্তি, তাম্রপাত্র, সিক্কা, নূতন পুথি, পুরাণো বই পাওয়া গিয়াছে, সেই সবগুলি এক জায়গায় জড় করিয়া দেখান উচিত। তাহার একটি প্রদর্শনী করা উচিত।

আর্থিক দিকে আমাদের দোষ-ত্রুটিও আছে। টাকা আদায়ের, বিশেষ চাঁদার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা ভাল নয়—অনেকে বলেন, আমাদের কাছে তাগাদাই হয় না, আমরা কি করিয়া টাকা দিই। শুধু যে আদায়-বিভাগের বন্দোবস্ত ভাল নয়, তাহা নহে; কোনও বিভাগের বন্দোবস্তই ভাল নয়। যাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত লোক, জ্ঞানী লোক, আপনাদের বুদ্ধিমত বন্দোবস্ত করিয়াছেন; কিন্তু কাজে দাঁড়াইয়াছে—শক্ত বাঁধন, ফস্কা গেরো। এই জন্য আমার ইচ্ছা, দিন কতক একজন অপণ্ডিত বিষয়ী লোক আমাদের বন্দোবস্তের ভার লন। এসিয়াটিক সোসাইটি, আমি যত দিন দেখিতেছি, প্রথম ছিল শিক্ষা-বিভাগের লোকের হাতে, তাহার পর যায় মিউজিয়ামের লোকের হাতে, তাহার পর যায় ইউনিভার্সিটির লোকের হাতে। সবই পণ্ডিত, বন্দোবস্তও পণ্ডিতী হইয়াছিল,—সভ্য-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, এমন কি, কোন বন্দোবস্তও ছিল না। তখন কথা উঠিল, বিষয়ী লোকের হাতে সোসাইটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ধরা হইল। তিনি প্রথমে আসিয়াই একজন বিষয়ী লোককে ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং মাহিনা দিয়া একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিলেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে সোসাইটির চেহারা ফিরিয়া গেল—এখন সভ্য-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে—বই বিক্রী হইতে তিন গুণ আয় হইতেছে—সোসাইটির যে সম্পত্তি ছিল, যাহা হইতে কিছুই পাওয়া যাইত না, এখন তাহা হইতে অনেক টাকা পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ত ৩৬ বৎসর পণ্ডিতের হাতে আছে, এখন একজন বিষয়ীর হাতে কিছুদিন থাকিলে ভাল হয়। ইহা আমার একটা বলিবার কথা ছিল, বলিলাম। আয়-বৃদ্ধি এবং ব্যয় কমান—দুইটাই দরকার, কিন্তু তাই বলিয়া পরিষদের কাজের প্রসার বন্ধ করা উচিত নয়।

পরিষদের আয়-ব্যয়ের কথা বলা হইল। এখন পরিষদের লেখাপড়ার কথা কিছু বলিতে চাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, পরিষদে পড়িবার মত প্রবন্ধ পাওয়া যাইত না। প্রবন্ধের অভাবে পত্রিকাও বাহির হইত না। পরিষদের সদস্যগণ আপনাদের প্রবন্ধ অন্যত্র দিতেন—তাহাতে কাজের বড় বিশৃঙ্খলা হইত। কিন্তু এখন সৌভাগ্যক্রমে

অনেক নূতন লেখক আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহাদের লেখাও বেশ ভাল হইতেছে এবং প্রবন্ধও রীতিমত পাওয়া যাইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথও পরিষদের উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা পরিষদে পাঠাইতেছেন। আমাদের পুরাণো সুদক্ষ লেখকেরাও প্রবন্ধ পাঠাইতেছেন। তাঁহারা এখন অনেকে আপনার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া কেবল লেখাপড়ার কার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সান্যাল নিজ নিজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কেবল লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেছেন ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইঁহারা আমাদের যে সহায়তা করিতেছেন, ইহার জন্য আমরা সকলেই ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ভরসা করি, ইঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের সহায়তা করিবেন। আমাদের পুরাণো দক্ষ লেখকেরাও আমাদের মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল আছেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আছেন, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ছিলেন, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার আছেন, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল আছেন, ৺নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য ছিলেন, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ আছেন। ইঁহারাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমরা এই দুই তিন বৎসর ধরিয়া বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি কতগুলি তরুণ লেখকের নিকট। ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত এবং এক এক বিষয়ে দক্ষ বৃহস্পতি এবং খুব মন দিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ও ডক্টররা আছেন, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ও ডক্টররা আছেন, টোলের পণ্ডিত মহাশয়েরা আছেন। কতকগুলি সম্পন্ন লোক আছেন, লেখাপড়ায় তাঁহাদের খুব সখ, এবং কতকগুলি লোক আছেন, লেখাপড়াই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইঁহাদের লেখায় আমাদের পত্রিকার খুব গৌরব হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের সকলের লেখা আলোচনা করি, তেমন শক্তিও আমার নাই, সামর্থ্যও আমার নাই এবং আমার অভিভাষণ এবার দীর্ঘ না হয়, ইহাও অনেকের ইচ্ছা—আমারও দীর্ঘ অভিভাষণ পড়িবার সামর্থ্য নাই; কিন্তু সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে এবং সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবারও সামর্থ্য আছে—তাই দুই চারিজন মাত্র লোকের নাম উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের লেখার আলোচনা করিব। যাঁহাদের নাম উল্লেখ না হইবে, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদের লেখার প্রতি আমার অনুরাগ কম।

১। শ্রীমান্ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস-সি। ইঁহার ব্যবসা ডাক্তারী—ইনি মেডিকেল কলেজের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, তথাপি ইনি অন্য অনেক শাস্ত্রের চর্চ্চা রাখেন, বিশেষ ঋগ্‌বেদের দেবতারা কোথা হইতে আসিল, তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং জ্যোতিষের চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহার সংস্কার, ঋগ্‌বেদের দেবতারা অনেকেই জ্যোতিষ হইতে আসিয়াছেন, কোনটি তারা, কোনটি নক্ষত্র, কোনটি গ্রহ, কোনটি বা ঋতু, আমাদের অয়নাংশ। বেদ ভিন্ন তিনি আরও অনেক শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছেন এবং সকল শাস্ত্রেরই দুই একটি প্রবন্ধ আমাদের দিতেছেন, প্রাণিবিজ্ঞানের কথাও দিতেছেন।

২। শ্রীমান্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেছেন, ইংরাজিতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে দুই খণ্ড বই লিখিয়া খুব নাম করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালীদের খুব উপকার করিয়াছেন। তিনি আমাদের এখানে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহাও আলোচনা করিয়া থাকেন। তিনি কয়েক বৎসর আমাদের পত্রিকাধ্যক্ষ থাকিয়া পত্রিকার বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। সুনীতিকুমার দুই একটি ভাল চেলা তৈয়ার করিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমান্ সুকুমার সেন একটি। তিনি আমাদের শব্দশাস্ত্র ও বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়াছেন।

৩। শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী এম এ, ডি লিট, প্রফেসর সিল্‌ভ্যান্ লেভির সহিত পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। চীনাভাষা খুব শিখিয়াছেন এবং চীনার একখানি অভিধানও লিখিতেছেন—সেটা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেপাল হইতে কয়েকখানি বাঙ্গালা নাটক পাইয়াছিলাম ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাহা ছাপাইয়াছিলাম। ডক্টর বাগ্‌চী সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আরও অনেক সেইরূপ বই সংগ্রহ করিয়াছেন এবং "নেপালে ভাষানাটক" নাম দিয়া আমাদের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন—প্রবন্ধটি অতি উত্তম হইয়াছে। ডক্টর বাগ্‌চীর পড়াশুনা যথেষ্ট আছে এবং নানা স্থানে তিনি নানা প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন।

৪। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি নিজে ইংরাজিতে Indian Historical Quarterly নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন এবং সে পত্রিকা এখন খুব পসার করিয়া লইয়াছে—বোধ হয়, ভারত সম্বন্ধে এমন সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ কোনও পত্রিকায় পাওয়া যায় না, তথাপি আমাদের উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। এখানে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি ভাল প্রবন্ধ দিয়াছেন এবং অনেক দিন আমাদের পত্রিকার অধ্যক্ষ থাকিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে একজন দোহার পাইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও আমাদের দুইটি প্রবন্ধ দিয়া বাধিত করিয়াছেন—দুইটিই অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে।

৫। শ্রীমান্ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ সকল কাগজেই অনেক প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং পরিষদের উপযুক্ত প্রবন্ধগুলি এখানে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ লিখিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার লেখা অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কার।

৬। শ্রীমান্ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বহুকাল কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন, তথাপি সাহিত্য-পরিষৎকে ভুলিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে আমাদের প্রবন্ধ দিতেছেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের বৌদ্ধগান ও দোঁহা নামক পুস্তক হইতে দুইখানি দোঁহাকোষ ফরাসী-ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া খুব নাম করিয়াছেন। তিনি ঐ দুইখানি দোঁহাকোষ ভোট-ভাষার তর্জ্জমার সহিত মিলাইয়া, উহার যে সকল অপূর্ণ অংশ ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

বৌদ্ধগান ও দোঁহায় দুইটি পাতা ছিল না, ভোট তর্জ্জমা হইতে তাহা উদ্ধার করিয়াছেন এবং উহার ভাষা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

৭। শ্রীমান্ গণপতি সরকার মহাশয় বিস্তর খরচপত্র করিয়া জ্যোতিষ ও নীতি-শাস্ত্রের বই পড়িয়াছেন ও তাহার বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। আমাদের এখানে তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল প্রবন্ধ দিয়াছেন—একটি জ্যোতিষ, বিবাহ-বৈধব্য সম্বন্ধে, আর একটি প্রজ্ঞানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব বিষয়ে।

৮। শ্রীমান্ সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল পাখীর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার একটি পাখীশালা আছে, তিনি দিনের মধ্যে অনেক সময় সেইখানেই কাটান। তিনি পুরুলিয়ার পাখী সম্বন্ধে আমাদের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দিয়াছেন।

৯। শ্রীমান্ মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, সহজিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ইনি মনে করেন, চণ্ডীদাস নামে অনেক কবি ছিলেন, তাহার মধ্যে দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য-দেবের অনেক পরের লোক এবং তাঁহারই পদাবলী বেশী।

১০। শ্রীমান্ রমেশ বসু এম এ অনেক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাঁহার প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ অতি সুপাঠ্য হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি একখানি লক্ষ্মণসেনের তাম্র-লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে বেশ গুণপনা দেখাইয়াছেন।

১১। শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ দত্ত—ইনি গণিতবিদ্যার ইতিহাস, বিশেষতঃ ভারতের গণিতের ইতিহাস লইয়া কতকগুলি অতি উপযোগী প্রবন্ধ দিয়াছেন, এবং এরূপ আরও প্রবন্ধ ইহাঁর নিকট হইতে আমরা আশা করি।

১২। শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বৈষ্ণব-সাহিত্য-আলোচনায় অগ্রণী, ইঁহার কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকার গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে।

সকলের কথা বলিতে পারিলাম না, তাহাতে কেহ যেন দুঃখিত না হন। এই যে তরুণগণ আমাদের অকাতরে উপকার করিতেছেন, ইঁহাদের উৎসাহ দিবার জন্য এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। এফ এ এস্ বি-র মত কোন একটা উপাধি সৃষ্টি করিয়া ইহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে হয় না? এফ্ এ এস বি-র উপাধিতে এসিয়াটিক সোসাইটির বেশ উপকার হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত উহার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি ৩৬ বৎসর হইয়া গিয়াছে। নানারূপ বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি সত্ত্বেও এই ৩৬ বৎসরের মধ্যে পরিষৎ দুইটি বড় বড় বাড়ী করিয়াছে, অনেক পাথরের মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছে, কাজ-করা ইট সংগ্রহ করিয়াছে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করিয়াছে, ভুটিয়া পুথি সংগ্রহ করিয়াছে, ছবি সংগ্রহ করিয়াছে, ছাপা পুথি সংগ্রহ করিয়াছে, ছাপা পুথির বড় বড় লাইব্রেরী সংগ্রহ করিয়াছে—তাহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের লাইব্রেরী প্রধান। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এই সকল বই, পুথি, চিত্রাদি লইয়া এখনও কেহ কাজ করিতে আসে নাই। আমাদের এখানে যে ভুটিয়া পুথি আছে, তেমন ভাল ছাপা পুথি কলিকাতায় আর কোথাও নাই। তেঙ্গুর সংগ্রহে প্রায় দশ হাজার সংস্কৃত পুথির তর্জ্জমা আছে—সে সকল সংস্কৃত পুথি লোপ হইয়াছে।

পুথি দু'একখান গুজরাট হইতে ও বোধ হয়, খানপঞ্চাশেক নেপাল হইতে পাওয়া গিয়াছে, বাকী সম্বল ঐ ভূটিয়া তর্জ্জমা। উহা হইতে ভারতবর্ষের, বিশেষ বাঙ্গালার নানাবিধ ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা লইয়া খাটিবার লোক পাওয়া গেল না। বাঙ্গালা বই প্রায় ত্রিশ হাজার আছে। ১৭৭৮ সালে প্রথম ছাপা বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে এ পর্য্যন্ত যত বই ছাপা হইয়াছে, প্রায়ই সব আছে, কিন্তু ইহা লইয়া খাটিবার লোক হইতেছে না। আমাদের সিক্কাগুলির একখানা বই আজও তৈয়ারী হয় নাই। মূর্ত্তিগুলির বই দু'একখানি হইয়াছে, কিন্তু সে বই বাহির হইবার পর আরও মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়াও কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। এক পণ্ডিত শ্রীমান্ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথিগুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছেন; কিন্তু পুথিগুলির একটা ভাল তালিকাও তৈয়ার হয় নাই, ছাপা পুথিগুলির তালিকাও হয় নাই। এই সকল কাজে শিক্ষানবিশী করিবার লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু শিক্ষানবিশের অভাব হইলে চলিবে না। পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষানবিশদের বসিতে দিবার জায়গা ছিল না, এখন অনেক জায়গা হইয়াছে, কিন্তু লোক কৈ? এই সকল জায়গায় শিক্ষানবিশ পাইলে এবং দুই তিন বৎসর কাজ করিলে তবে ত লোকে পণ্ডিত হইবে, তবে ত তাহারা নিজে নিজে প্রবন্ধ লিখিতে শিখিবে, তবে ত সাহিত্য-পরিষদের পসার-প্রতিপত্তি হইবে। কিন্তু সে বিষয়ে এখনও কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই—পড়া অত্যন্ত উচিত, নহিলে রাশীকৃত জিনিষ সংগ্রহ হইয়া পচিতে থাকিলে চলিবে না—তাহার ভাল ব্যবহার হওয়া চাই—তবে ত দেশের উপকার হইবে—তবে ত তাহার দ্বারা সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হইবে, তবেই ত ইতিহাসের অন্ধকার ছুটিবে। দেশশুদ্ধ লোক ইতিহাসের জন্য পাগল হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইতিহাসের কথা জিজ্ঞাসা করিবার লোক ছিল না। এখন অনেক লোক হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের সম্বল ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ বা জার্ম্মাণ। নিজে খাটিয়া নিজের দেশ হইতে নিজের দেশের ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা অতি অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাও খুব ধীরে ধীরে হইতেছে। ইহার ধীরগতি দ্রুত হওয়া চাই। ইতিহাসের জন্য লোকের চোখ তৈয়ার হওয়া চাই। এই যে প্রকাণ্ড সহর কলিকাতা, ইহার প্রতি গলিতে ইতিহাসের প্রচুর মালমসলা পড়িয়া আছে। কিন্তু সেই ইতিহাস সংগ্রহের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ কোন উপায় করিয়াছেন কি? এই কলিকাতায় বসিয়াই উইলসন্ সাহেব হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা করি না—আমরা ঘরে ইলেক্‌ট্রিক পাখার নীচে বসিয়া বই পড়িয়া যাহা পারি, তাহাই করি—বেশী কিছু করিতে পারি না। একটু বাহির হইয়া কলিকাতায় ঘুরিলে, যদি ঠিক চোখ থাকে, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও আগ্রহ দেখিতে পাই না। এই সকল বিষয়ে যাহাতে আগ্রহ হয়, পরিষদের সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। পরিষদের মুরুব্বিরা সকলেই সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহাদের একটু নজর থাকিলেই তাঁহারা কটাক্ষে বহুসংখ্যক শিক্ষানবিশের দ্বারা এই সকল কাজ

করাইয়া লইতে পারেন, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রভূত উপকার হয়। কলিকাতার বাঙ্গালীদের ইতিহাস একেবারেই লেখা হয় নাই। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, ধীরে ধীরে নানাবিধ চেষ্টা করিয়া এই সকল সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদে আনিয়া, তাঁহার দ্বারা কতকগুলি ছাত্র-সভ্য তৈয়ারী করিয়া, ঐ কাজটি অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার ইতিহাসের দুই চারিটি সমস্যার কথা বলিয়া আমার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ শেষ করিব। আমি সমস্যাগুলি বলিতে পারি, কিন্তু সমস্যাগুলি পূরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যীশুখ্রীষ্টের অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐতরেয় আরণ্যক সংগ্রহ হয়। উহার প্রথম আরণ্যকে মহাব্রত নামে এক যজ্ঞের কথা আছে, দ্বিতীয় আরণ্যকে ঋগ্বেদের মন্ত্ররাশি ও তাহার শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির কথা আছে। কিন্তু উহার প্রথমেই লেখা আছে, "তৎ উক্তং ঋষিণা প্রজা হ তিস্রঃ" ইত্যাদি। ঐতরেয় আরণ্যক একজন ঋষির বাক্য বলিয়া এইটি তুলিয়াছেন; সুতরাং এটি ঐতরেয় আরণ্যক লেখার পূর্ব্বে লেখা। ঐতরেয় আরণ্যক ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তিন প্রজা অর্থাৎ বঙ্গ, বগধ ও চেরোপাদ, ইহারা ধর্ম্মের বাহিরে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমাদের বাঙ্গালায় বঙ্গ, বগধ ও চেরো নামে তিনটি জাতি ছিল। বঙ্গ জাতি কোথায় গেল, অনেকে অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোনটাই মনের মত হয় না, অথচ দেশটা তাহাদেরই নামে আজিও চলিতেছে। এই বঙ্গেরা কোথায় গেল, ইহা একটা সমস্যা। বঙ্গের পর বগধ, বগধের পর চেরো—চেরো মানে কেরল জাতীয় লোক। ইহারা এখনও ছোটনাগপুরে বাস করিতেছে। বগধ কোথায় গেল? আমার সন্দেহ হয়, ইহারা রাঢ় দেশের বাগ্দী। বাগ্দীরা একটি জাতি, যাহাকে ইংরাজিতে 'এথ্‌নোস' বলে। উহাদের ভিতর অনেক জাতি আছে। নামে বাগ্দী, কিন্তু সেই বাগ্দীদের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিবাহ আদি নাই। উহাদের সামাজিক অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন, কেহ বড়, কেহ ছোট। উহারা প্রায়ই শুদ্ধাচারী। উহাদের ভিতর বিধবা-বিবাহ একেবারে নাই। এখন উহারা বাঙ্গালাই বলে, বাঙ্গালা দেশের অন্য নানা জাতির মত; কিন্তু এককালে বোধ হয় বলিত না। কিন্তু বাঙ্গালার অনেক কথা এই ভাষা হইতে আসিয়াছে। এই বাগ্দী জাতি বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি সমস্যা। ইহারাই বাঙ্গালার সিপাহী ছিল। রাঢ়ে অনেক জায়গায় বাগ্দী রাজার কথা শুনা যায়। লোকে বলে, বিষ্ণুপুরের রাজারা বাগ্দী ছিলেন। বাগ্দীদের ভিতর ঢুকিয়া উহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি মস্ত সমস্যা পূরণ হইবে।

যোগী জাতি বাঙ্গালার আর একটী সমস্যা। 'কৌলজ্ঞানবিনির্ণয়' নামে এক বইয়ে আছে, মহাদেব চন্দ্রদ্বীপে গিয়া মৎস্যঘ্নাথকে মন্ত্র দেন—তাহা হইতেই কৌল ধর্ম্মের উৎপত্তি। এখনও দেখা যায়, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গ্রামকে গ্রাম কৌল জাতিতে পরিপূর্ণ। ইহাদের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের এক প্রধান অঙ্গ কিন্তু সে ইতিহাস একটি সমস্যা। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালায় মাছধরা, নৌকাচালান প্রভৃতি কৈবর্ত্ত জাতির কাজ ছিল। ব্রাহ্মণেরা কৈবর্ত্তদিগকে দস্যু বলিত। যেমন শকেরা দস্যু, যবনেরা দস্যু, পহ্লবেরা দস্যু, মেদেরা দস্যু, ভীলেরা দস্যু, তেমনি কৈবর্ত্তেরাও দস্যু অর্থাৎ তাহারা আর্য্যসমাজের বিরোধী কোন এক জাতি। এখনও বাঙ্গালার সেন্‌সাস্‌ দেখা যায়, হিন্দুদের

ভিতর কৈবর্ত্তের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। ব্রাহ্মণেরা তাহাদের লইতেন না, যেহেতু তাহারা দস্যু, বৌদ্ধেরা তাহাদের লইতেন না, যেহেতু তাহারা নিরন্তর প্রাণিবধ করে—তাই মহাদেব তাহাদের এক নূতন ধর্ম্ম দিয়াছেন। কিন্তু এটা আমার কথা মাত্র। আমি যোগী জাতি, কৌল ধর্ম্ম ও কৈবর্ত্ত জাতি বাঙ্গালার তিনটি মহা সমস্যা বলিয়া মনে করি। সকল সমস্যা পূরণের জন্য সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিৎ।

আমার অনুরোধ এই সকল সমস্যা পূরণের জন্য যত্ন করিবেন। আমাদের তরুণেরা এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। আমার দ্বারা এ সকল কাজ আর হইবে না। আমি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, বিদায় লইয়া যাই। বিদায়ের পূর্ব্বে বলিয়া যাই যে, আপনাদের ভবিষ্যৎ খুব গৌরবময়। এখনকার তরুণেরা এবং তাঁহারা বৃদ্ধ হইলে যে সকল তরুণেরা আসিবে তাহারা বাঙ্গালার ইতিহাসের সমস্ত সমস্যা পূরণ করিয়া দিবে। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে। এখন আমরা দুইটি বাড়ী করিয়াছি বলিয়া গৌরব করিতেছি, তখন ইহাদের আশ্রম খালধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে—পরিষদের কার্য্য নানাশাখায় বিভক্ত হইবে, প্রত্যেক শাখা হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্রিকা বাহির হইবে। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার মিউজিয়াম পৃথিবীর অন্যান্য পরিষৎ ও মিউজিয়ামকে ছাড়াইয়া উঠিবে, কারণ বাঙ্গালা অতি প্রাচীন দেশ। এইরূপ নদীমাতৃক দেশেই সভ্যতার প্রথম উৎপত্তি—বাঙ্গালার সভ্যতা যে কত প্রাচীন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

বিদায়কালে আরও এক কথা বলি, এই সুদীর্ঘ তের বৎসরের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে যদি কাহারও মনে কোনও কষ্ট দিয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, যদি আমার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিও আমাকে ক্ষমা করিবেন, কারণ আমি নিঃস্বার্থভাবে যথাসাধ্য সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছি।

আমার আর যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা সম্পাদক মহাশয় বার্ষিক বিবরণীতে বলিয়াছেন। আমার বলার মধ্যে এ বৎসর আমাদের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে, যেহেতু মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যিনি আমাদিগকে শৈশবাবস্থা হইতে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের একনিষ্ঠ-সেবক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

"অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" *

গণিত বিধি

হিন্দুর গণিতশাস্ত্রে একটা সাধারণ বিধিবাক্য আছে,—"অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" বা "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"। এই বাক্যের প্রকৃতার্থ কি, গণিতে তাহার প্রয়োগ-স্থল কোথায়, এবং তাহার উৎপত্তির হেতু কি,—এই সকলের আলোচনা করা, বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আর্য্য জাতিগণ সাধারণতঃ বাম দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিক্-ক্রমে লিখিয়া থাকেন। এই পদ্ধতির সংস্কৃত সংজ্ঞা 'সব্যক্রম,'—সব্য = বাম, ক্রম = বিধি, গতি, পদ্ধতি। আরব, পার্শী প্রভৃতি সেমেটিক জাতিগণ দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম-দিক্-ক্রমে লেখেন। সংস্কৃত ভাষায় ঐ পদ্ধতিকে বলা হয় 'অপসব্যক্রম'। যাহা সব্যের বিপরীত, তাহাই অপসব্য; অপসব্য = দক্ষিণ। চীন, জাপানী প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জাতিগণ ঊর্দ্ধদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোদিক্-ক্রমে লেখেন। এই পদ্ধতিকে, সেই হিসাবে, ঊর্দ্ধক্রম বলা যাইতে পারে।

গণিতশাস্ত্রে যে পদ্ধতিকে 'বামাগতি' বলা হইয়া থাকে, তাহা 'সব্যক্রম' নহে; বস্তুতঃ 'অপসব্যক্রম'। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'বাম' শব্দের উপর 'তস্' প্রত্যয় করিয়া, সংস্কৃত 'বামতঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তস্ প্রত্যয় সাধারণতঃ তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তিতে হয়। পঞ্চমী বিভক্তি গ্রহণ করিলে, 'বামতঃ' শব্দের অর্থ হইবে 'বাম দিক্ হইতে', 'অর্থাৎ সব্যক্রমে'। কিন্তু গণিতশাস্ত্রের 'বামতো গতিঃ' পদের অর্থ উহার ঠিক বিপরীত। সুতরাং ধরিতে হইবে যে, ঐ স্থলে তৃতীয়া কিংবা সপ্তমীতে তস্ প্রত্যয় হইয়াছে। অতএব 'বামতো গতিঃ' বাক্যের প্রকৃতার্থ 'বাম দিকে গতি'। উহা হইতেই গণিতে সংজ্ঞা হইয়াছে 'বামাগতি' ইহাকে কখন কখন 'বামক্রম'ও বলা হয়[১]। সংস্কৃত ভাষায় বাম শব্দের আর এক অর্থ আছে,—'বিপরীত' যথা,—বামাচার। আর্য্যজাতির সর্ব্বমান্য বৈদিক আচারের বিপরীত বলিয়াই কোন কোন তান্ত্রিক আচারকে বামাচার বলা হয়। গণিতশাস্ত্রের 'বামাগতি' শব্দের অর্থ 'বিপরীত গতি'ও হইতে পারে। অঙ্কের গতি আর্য্যলিপিগতির বিপরীত বলিয়া, হিন্দুর চোখে তাহা 'বামাগতি'। বস্তুতঃ প্রাকৃত ভাষায় স্পষ্টরূপে ঐ কথা বলা হইয়াছে,—"অংকট্ঠানা পরাহুত্তা।" 'পরাহুত্তা' অর্থ 'পরাঙ্‌মুখে', অর্থাৎ 'বিপরীত ক্রমে'। জৈন সাহিত্যে সব্যক্রমকে 'পূর্ব্বানুপূর্ব্বী' এবং অপসব্যক্রমকে 'পশ্চানুপূর্ব্বী' বলা হয়।

---

* ১৩৩৭।৭ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ গণেশ লিখিয়াছেন, "একদশশতেত্যাদি বামক্রমেণ সংখ্যাগ্রাঃ" (লীলাবতী-টীকা)।

অঙ্কস্থানবিন্যাসে বামাগতি

হিন্দুর গণিতশাস্ত্রে দুই স্থলে বামাগতি বিধির প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথমতঃ, অঙ্কস্থানের পর্য্যায়বিন্যাসে, দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে। প্রথমোক্ত স্থলে উহা সাধারণ বিধি; সুতরাং অবশ্য পালনীয়। অন্য স্থলে তাহা নহে। গণিতশাস্ত্রে সাধারণতঃ আঠারটা অঙ্কস্থান আছে।[১] তাহাদের নাম যথাক্রমে,—একক, দশক, শতক, সহস্র প্রভৃতি। দশক স্থান একক স্থানের বামে, শতক স্থান দশক স্থানের বামে, এই প্রকার পরম্পরা-ক্রমে প্রতি অঙ্কস্থানের বিন্যাস তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বটার বাম দিকে হইয়া থাকে। আরও দ্রষ্টব্য, কোন স্থানস্থিত অঙ্কবিশেষের মান তদ্দক্ষিণে বিন্যস্ত স্থানে অবস্থিত সেই অঙ্কেরই মানের দশগুণ এবং তাহার ঠিক বামের স্থানে অবস্থিত সেই অঙ্কের মানের দশমাংশ। সুতরাং কোন অঙ্ক যে কোন অঙ্ক-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া যতই বামদিকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, তাহার মান ততই দশ দশ গুণ করিয়া বাড়িয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে এই সংখ্যাটা গ্রহণ করা যাউক,—৩৩৩৩। উহা চারি অঙ্কস্থান-ব্যাপী এবং প্রত্যেক স্থানে একই অঙ্কচিহ্ন ৩ আছে। কিন্তু ডান দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় তিনের মান প্রথম তিনের দশগুণ; তৃতীয় তিনের মান দ্বিতীয় তিনের দশগুণ এবং চতুর্থ তিনের মান তৃতীয় তিনের দশগুণ। ঐ সংখ্যাকে বাক্যে প্রকাশ করিতে বলা হয়,—তিন হাজার তিন শত তেত্রিশ। এক হইতে গণনা আরম্ভ। একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন, তৎপরে চার—এইরূপে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা একস্থানব্যাপী। নয়ের পরবর্ত্তী সংখ্যা দশ। দশমিক সংখ্যালিখন-প্রণালীতে উহার অঙ্ক দ্বিস্থানব্যাপী। নবাগত দ্বিতীয় স্থান প্রথম স্থানের বামে বিন্যস্ত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক নব নব অঙ্কস্থান তাহার পূর্ব্বাগত অঙ্কস্থানের বামে বিন্যস্ত হয়।

রেকর্ডের মত ও তাহার খণ্ডন

বর্ত্তমান কালে সমস্ত সভ্যজগতে প্রচলিত দশমিক সংখ্যালিখন-প্রণালীতে বামাগতিতে অঙ্কস্থান-বিন্যাস-পদ্ধতি দেখিয়া রবার্ট রেকর্ডে (প্রায় ১৫৪২ খ্রীষ্ট সাল) নামক জনৈক ইংরাজ গণিতজ্ঞ অনুমান করেন যে, উহার আবিষ্কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক অপসব্যক্রমলিপিক কোন জাতিই—কাল্ডীয় বা ইহুদী হইবে।[৩] মধ্যযুগের অপর কোন কোন পাশ্চাত্য

১। হিন্দুগণিতের মতে গণনাস্থান বস্তুতঃ অসংখ্য। তবে সাধারণ ব্যবহারের জন্য আঠারটা স্থান পর্য্যাপ্ত বলিয়া ধরা হয় মাত্র। কেহ কেহ ততোঽধিক গণনাস্থানও ধরিয়াছেন। বায়ু-পুরাণে আছে,—

"এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধৌ॥
শতানীতি বিজানীয়াৎ সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ॥"

—১০১।১০২-৩ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

পরার্দ্ধের দ্বিগুণফলে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে।

২। পৃথূদক স্বামী এই প্রকার সংখ্যাকে 'চতুষ্পদ' সংখ্যা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে একস্থানব্যাপী সংখ্যা 'একপদ,' দ্বিস্থানব্যাপী সংখ্যা 'দ্বিপদ', বহুস্থানব্যাপী সংখ্যা 'বহুপদ'। (ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, ১২শ অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩। D. E. Smith and L. C. Karpinski, *The Hindu-Arabic Numerals*, Boston; 1911, p. 3.

গণিতবিদ্‌ও ঐ প্রকার মনে করিতেন। আধুনিক কালে জি. আর. কে. ঐ মতের পুনঃ প্রচার করেন।[১] তাঁহাদের যুক্তি এই প্রকার—হিন্দুরা যেহেতু সব্যক্রমে লিখেন, সেই হেতু নবাগত দ্বিতীয় স্থানটীর বিন্যাস তাঁহারা প্রথমাঙ্কস্থানের দক্ষিণে করিতেন, সেই হেতু শতক স্থানের বিন্যাস তাঁহারা দশক স্থানের দক্ষিণে করিতেন। কিন্তু অঙ্কস্থানের বিন্যাস যখন বস্তুতই অপসব্যক্রমে হইয়াছে, তখন ঐ প্রকার সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক সব্যক্রমিক লিপি-পদ্ধতি অনুসরণকারী হিন্দুজাতি হইতে পারে না, অপসব্যক্রম-লিপিক অহিন্দু জাতিই হইবে। এই অনুমান যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, স্বল্পজ্ঞান-প্রসূত, তাহা আমরা অন্যত্র বিশেষ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি।[২] সভ্যজগতের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন, নানা জাতির সংখ্যা নির্দ্দেশের ভাষা ও সঙ্কেত চিহ্নের আলোচনা সহকারে তথায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কি সব্যক্রমলিপিক, কি অপসব্যক্রম-লিপিক বা কি ঊর্দ্ধক্রম-লিপিক, সকল জাতির মধ্যে ইহা সাধারণ বিধি যে, বড় স্থানের অঙ্কটাকে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে ও লিখিতে হইবে। ইহাকে বলিব অপচীয়মান ক্রম। তাহার বিপরীত সংজ্ঞা উপচীয়মানক্রম। যে ক্রম এই উভয় হইতে ভিন্ন, তাহাকে বলা হইবে মিশ্রক্রম। সংস্কৃতে শতের নিম্নতন সংখ্যার নামকরণে উপচীয়মানক্রম অনুসৃত হইয়া থাকে। যথা,—পঞ্চদশ, চতুর্বিংশ, ত্রিসপ্ততি ইত্যাদি। এই সকল দৃষ্টান্তে প্রথমে ছোট সংখ্যার পরে বড় সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে। এই সম্পর্কে বৈয়াকরণ-সম্রাট্ পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,[৩] "অল্পাচ্ তরম্", অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসে অল্পতর স্বরনিষ্পন্ন শব্দ পূর্ব্বে বসিবে। তার উপর বার্ত্তিককার বিশেষ সূত্র করিলেন,—"সংখ্যায়া অল্পীয়স্যাঃ।" আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়, গ্রীক, লাটিন, আরবী, পার্শী, চীন প্রভৃতি ভাষাতেও ঐ বিধি। কিন্তু শতের ঊর্দ্ধতন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যে বরাবর অপচীয়মানক্রম অনুসৃত হয়। যেমন আমরা বলি, 'এক লক্ষ পাঁচ হাজার আট শত পয়ত্রিশ।' ইংরাজী ও তিব্বতী প্রভৃতি দুই চারিটা ভাষায় আগাগোড়া অপচীয়মানক্রমে সংখ্যা উল্লেখ হইয়া থাকে। এই ত গেল সংখ্যার নামকরণ-পদ্ধতি। সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্নের বা অঙ্কের সমাবেশের পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৃহত্তর সংখ্যাঙ্ককে সর্ব্বাগ্রে রাখার বিধি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসৃত হয়। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে জগতের নানা জাতির মধ্যে সংখ্যা-লিখনের নানা প্রণালী ছিল। যথা,—প্রাচীন গান্ধারের খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী প্রণালী, মিশরের চৈত্রিক, হাইরেটিক ও ডেমোটিক প্রণালী, গ্রীসের এটিক ও অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী, বাবিলন, রোমান, চীন প্রণালী ইত্যাদি। তখনও স্থানীয় মানতত্ত্বের প্রচলন হয় নাই।[৪] ঐ সকল

১। G. R. Kaye, "Notes or Indian Mathematics—Arithmetical Notation," *J. A. S. B*, Vol. III, 1907 pp. 475-508 ; *Indian Mathematics*, Calcutta, 1915 p. 32.

২। Bibhutibhusan Datta, "The present mode of expressing numbers," *Indian Historical Quarterly*, Vol. III, 1927, pp. 530—540.

৩। ২।২।৩৪

৪। প্রাচীন সুমের জাতির ষষ্টিতক (বা ষষ্ট্যোত্তর) সংখ্যালিখন-প্রণালীতে স্থানীয় মানতত্ত্বের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই বিষয়ে লেখকের অপর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য Early History of the Principle of Place Value.

প্রণালীতে যোগবিধি মতে সংখ্যা লিখিত হইত। অর্থাৎ প্রত্যেক চিহ্ন-বোধিত সংখ্যার যোগ করিয়া, সেই চিহ্নসমূহ-বোধিত সংখ্যা নিরূপিত হইত। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট কোন পর্য্যায়ক্রমে সংখ্যা-চিহ্নের সমাবেশ তাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য ছিল না। তথাপি তত্তৎপ্রণালীতে সংখ্যা লিখিতে বড় অঙ্কের চিহ্নটাই পূর্ব্বে লিখিতে হইত। ইহাই ছিল সর্ব্বমান্য নিয়ম। সেই হেতু সব্যক্রম-লিপিক জাতিরা বৃহত্তর অঙ্কচিহ্নটি ক্ষুদ্রতর অঙ্কচিহ্নের বামে বিন্যস্ত করিত। অপসব্যক্রম-লিপিক জাতির প্রথা ছিল তাহার ঠিক বিপরীত এবং ঊর্দ্ধক্রমলিপিক-জাতি বৃহত্তর অঙ্কচিহ্নটিকে ক্ষুদ্রতর অঙ্কচিহ্নের উপরে বিন্যাস করিত। ভারতবর্ষে দেখা যায়—কখন কখন মুদ্রায় সন তারিখ এবং পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দ্দেশে—ছোট চিহ্নকে বড় চিহ্নের নিম্নে বিন্যস্ত করা হইত।[১] স্থান সঙ্কুলানের জন্যই যে ঐ ব্যবস্থা, তাহা সহজেই বোঝা যায়। প্রথম খ্রীষ্ট-শতকের কোন কোন চীন গণিতজ্ঞ ঠিক হিন্দুদের প্রথাতেই সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেন।[২] উহাকে নিশ্চয়ই হিন্দু-প্রভাব বলিতে হইবে। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই প্রকারের দুই চারিটা ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও তাহাতে সাধারণ বিধির বিশেষ হানি হয় না। অধিকন্তু ইহাও দেখা যায় যে, যখন কোন ভাষার লিপিক্রম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই ভাষায় অঙ্কবিন্যাসক্রমও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।[৩] এইরূপে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জাতির সংখ্যা-প্রণালীতে অঙ্কচিহ্নের উপচীয়মান বা অপচীয়মানরূপে বিন্যাসক্রম, তত্তৎজাতির অনুসৃত লিপির উপচয়াপচয় ক্রমের বিপরীত। সুতরাং দশমিক সংখ্যা লিখন-প্রণালীতে অঙ্কস্থানের ক্রমবিন্যাস দেখিয়া যাঁহারা অনুমান করেন যে, উহা কোন অপসব্যক্রম-লিপিক জাতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, তাঁহারা প্রমাদগ্রস্ত। ঐ প্রকার যুক্তি সত্য মানিলে বলিতে হইবে যে, জগতের প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব সংখ্যা-লিখন-প্রণালী তদ্‌বিপরীত ক্রম-লিপিক কোন জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কোন বিচারবুদ্ধিশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিতে পারেন না। অতএব দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্কস্থান-বিন্যাসে বামাগতি অবলম্বনের কারণে কেহ বলিতে পারিবেন না যে, উহা হিন্দু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নহে। শুধু তাহা নহে, আমাদের বিচারে, ঐ কারণেই সিদ্ধান্ত হয় যে, উহা সব্যক্রম-লিপিক আর্য্যজাতি কর্ত্তৃকই উদ্ভাবিত। বস্তুতঃ, উহা যে হিন্দুরই আবিষ্কার, তাহার অনেক অকাট্য প্রমাণ আছে। গণিতৈতিহাসিক মহলে তাহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আমরাও ইতিপূর্ব্বে তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি।

স্থানবিন্যাসে বামাগতির কারণ

উপরে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে অঙ্কস্থানের ক্রমবিন্যাসে বামাগতি অবলম্বনের প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৃহত্তর অঙ্কটাকে পূর্ব্বে লেখার

১। Buehler, *Indian Palaeography*, English tr. by Fleet, pp. 77-8

২। Y. Mikami, *The Development of Mathematics in China and Japan*. Leipzig, 1913, p. 27f.

৩। যথা,—খরোষ্ঠী লিপি।

মনোবৃত্তি প্রায় মানবসাধারণ। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্কের ছোট বড় মান নির্ণীত হয় রূপগুণ বা আকৃতিগুণ দ্বারা নহে, কিন্তু স্থানগুণ দ্বারা। অর্থাৎ অপরাপর প্রণালীতে বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন রূপ ছিল, সেই রূপ দেখিয়াই তাহার মান নির্ণীত হইত। কিন্তু দশমিক প্রণালীতে নয়টার বেশী রূপ নাই। এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাকে রূপগুণ আছে। কিন্তু ততোঽধিক সংখ্যা লিখিতে স্থানগুণের অবতারণা করা হয়। স্থান-বিন্যাস-গুণে একই রূপের মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। হিন্দুরা সব্যক্রমে লিখিয়া থাকেন। সুতরাং বৃহত্তর অঙ্ককে প্রথমে লিখিতে হইলে তাঁহাদিগকে বৃহত্তর মানজ্ঞাপক অঙ্কস্থানকে ক্ষুদ্রতর মানজ্ঞাপক অঙ্কস্থানের বামে বিন্যাস করিতে হইবে। এইরূপেই দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্কস্থান-বিন্যাসে বামাগতির উৎপত্তি। যদি কেহ শঙ্কা করেন যে, বৃহত্তর অঙ্ককে পূর্ব্বে লিখিতে হইবে কেন? উত্তর, উহা মানবসাধারণ মনোবৃত্তি, অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হইতে পারে না। বার্ত্তিককার সূত্র করিয়াছেন :—

"অভ্যহিতম্"—

দ্বন্দ্বে অভ্যহিত পদের পূর্ব্বনিপাত হইবে। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীর উদ্ভাবক সেই সুপ্রাচীন পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

প্রাচীন মত—গণেশ দৈবজ্ঞ

প্রাচীন গণিতজ্ঞগণও প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন। বিখ্যাত গণিতবিদ্ গণেশ দৈবজ্ঞ (১৫৪৫ খ্রীষ্ট-সাল) বলেন,—

"গণনাক্রম সর্ব্বত্র সব্যক্রমেই হওয়া উচিত। যেহেতু অপসব্যক্রম সর্ব্বদাই শিষ্টগর্হিত। একক-দশকাদি সংজ্ঞার বামাগতি ব্যতিরেকে গণনায় সব্যক্রম হওয়া সম্ভব নহে। যেমন ১২৩৪, এই সংখ্যাটিকে 'এক হাজার দু' শ' তিন দশক ও চার'—এই প্রকারে বলাই সব্যক্রমে গণনা, সেই জন্য লোকেও সেই প্রকারে করিয়া থাকে। 'চার তিরিশ দু' শ' এক হাজার' কেহ বলে না।২ আরও দেখ, কাল বর্ণনা করিতে লোকে পরার্দ্ধ-কল্প-মন্বন্তর-যুগ-বৎসরাদিক্রমে করিয়া থাকে, দেশবর্ণনা করিতে দ্বীপ-বর্ষ-খণ্ডাদিক্রমে বলে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রতরের দিকে গতিক্রমেই লোকে (স্বভাবতঃ) বলিয়া থাকে। গণনায়ও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে, অঙ্কস্থানের বামাগতিই সব্যক্রম হইবে। সেই হেতু বামা-গতিতেই অঙ্কস্থানের এককাদি সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।"৩

১। ২।২।৩৪ (৪)

২। ইহার ব্যতিক্রম ও বিশেষ বিধির দৃষ্টান্ত পরে দ্রষ্টব্য।

৩। "গণনাক্রমঃ সর্ব্বত্র সব্যক্রমেণৈব ভাব্যঃ। সর্ব্বত্রাপসব্যক্রমস্তু শিষ্টগর্হিতত্বাদেকাদিসংজ্ঞানাং বামক্রমমন্তরেণ গণনায়াঃ সব্যক্রমো ন সম্ভবতি। যথৈবামঙ্কানাং ১২৩৪ একং সহস্রং দ্বে শতে দশকত্রয়ং চত্বারশ্চেতি সব্যক্রমেণ গণনা স্যাৎ। লোকৈরপ্যেবমেব ক্রমেণোচ্যতে। ন তু চত্বারি ত্রিংশদ্বে শতে সহস্রমেবমিত্যুচ্যতে। অপি চ কালকীর্ত্তনং প্রয়োগেঽপি পরার্দ্ধকল্পমন্বন্তরযুগবৎসরাদিকং দেশকীর্ত্তনেঽপি দ্বীপবর্ষখণ্ডাদিকং চ স্থূলসূক্ষ্মমিত্যনেনৈব ক্রমেণোচ্যতে। এবমুচ্যমানে গণনায়াঃ সব্যক্রমস্থানানাং বামক্রমো ভবতি। তস্মাদেকাদিস্থানানাং বামক্রমেণৈককাদিসংজ্ঞেতি সমাচারঃ।" 'বুদ্ধিবিলাসিনী' (লীলাবতী টীকা)

নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ও মুনীশ্বর

পরবর্ত্তী কালে নৃসিংহ দৈবজ্ঞ এবং মুনীশ্বর আরও স্পষ্টবাক্যে সেই যুক্তি দিয়াছেন। অধিকন্তু গণনাতে বড় অঙ্কটাকে আগে লিখিতে ও বলিতে হইবে কেন, তাহারও নজীর দিয়াছেন। গণেশ ইহাকে মানবসুলভ প্রবৃত্তি বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ঐ প্রবৃত্তির মূলে যে পূজ্যের সম্মান সর্ব্বাগ্রে করার স্বাভাবিক বৃত্তি রহিয়াছে, ইহারা তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। নৃসিংহ লিখিয়াছেন,১—

"অভ্যর্হিতস্থানস্থস্য পঙ্‌ক্তৌ পূর্ব্বনিবেশস্তদধঃস্থিতস্থানানাং সব্যক্রমেণ স্থাপনমুচিতং, লোকেষু তথা দৃশ্যতে। তৎ ত্বেকস্থানাদ্বামক্রমেণ দশকাদিস্থানবিন্যাসেনোপপদ্যতে। অথবা পরমাণুমধিকৃত্য দ্ব্যণুকাদিসংজ্ঞাঃ ক্রিয়তে। তদ্বদেকস্থানমধিকৃত্য দশকাদিস্থানসংজ্ঞাকরণে ন কশ্চিদ্দোষঃ। একাদিস্থানসাধ্যাদ্দশস্থানাদীনামুত্তরোত্তর সংখ্যায়াঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসংখ্যায়াঃ সত্ত্বাৎ।"

নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ১৬২১ খ্রীষ্ট সালে ঐ মত লিপিবদ্ধ করেন। মুনীশ্বর ১৬৩৫ সালে লিখিয়াছেন।২

"নন্বস্তি লিপিষু সব্যক্রমঃ শিষ্টসম্মতো মাঙ্গলিকত্বাদাদরণীয়শ্চ। তৎ কথং তমপহায়াপসব্যক্রম আদৃত ইতি চেন্ন, শতসহস্রাযুতাদীনামুত্তরমভ্যর্হিতত্বেন তদুচিতসব্যক্রমদ্বারৈস্তৎক্রমস্য যুক্তত্বাৎ। ন চাভ্যর্হিতসংখ্যাতঃ সব্যক্রমার্থমুত্তরাবধিতঃ প্রদক্ষিণ-ক্রমেণৈব দ্বিতীয়াদিস্থানানাং সংজ্ঞাঽস্তিতি।"

এ স্থলে কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, গণনাস্থান একক হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া ইহাতে বামক্রমে স্থানবিন্যাস করিতে হয়, কিন্তু উর্দ্ধতন স্থান হইতে আরম্ভ করিলে ঐ প্রকার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিতে হইত না। এই শঙ্কা অকিঞ্চিৎকর হইলেও প্রাচীনেরা তাহার জবাব দিয়া গিয়াছেন।—সংখ্যা বস্তুতঃ অনন্ত, সুতরাং স্থানও অনন্ত। সেই হেতু উর্দ্ধতন স্থানের অবধি নাই। যাহার অবধি নাই, তাহা হইতে আরম্ভ হইতে পারে না। সাধারণতঃ একটা অবধি ধরা হয় বটে, কিন্তু উহাও লোকব্যবহারমাত্র। অধিকন্তু তদ্বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অষ্টাদশ স্থান পরার্দ্ধকে শেষ অবধি মানেন। অপরে আরও অধিক স্থানের উল্লেখ করেন। সুতরাং শেষ অবধি অনিত্য। অপর পক্ষে প্রথমাবধি, একক স্থান, নিয়ত। তাই তথা হইতে আরম্ভ করা হয়। সুতরাং অঙ্কে বামাগতি না হইয়া পারে না।৩ এতদপেক্ষাও অতি সহজে পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাস করা যায়।

১। 'বাসনাবার্ত্তিক' (সিদ্ধান্তশিরোমণির). মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ২৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি', নৃসিংহের 'বাসনাবার্ত্তিক' ও মুনীশ্বর-কৃত 'মরীচি' নামক টীকা সহ, কাশীর পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্ট-সালে, তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

২। 'মরীচি' মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ১৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। স্বপ্রণীত 'পাটীসারে' (১২-১৫ শ্লোক)ও মুনীশ্বর ভিন্ন প্রকারে ইহাই বলিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনো মুদ্রিত হয় নাই। কাশী সরস্বতী-ভবনে, উহার পাণ্ডুলিপি আছে। লেখক সম্প্রতি তাহার এক প্রতিলিপি আনাইয়াছে।

৩। কৃষ্ণদৈবজ্ঞের (১৬৩৫ খ্রীষ্ট সাল) মত বলিয়া নৃসিংহ এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "উক্তমেবাত্র বীজগণিতং ব্যাখ্যাতবদ্ভিঃ কৃষ্ণদৈবজ্ঞৈরুত্তরাবধেরভাবাৎ পরিচ্ছিন্নসংখ্যাস্থ তৎসত্ত্বেঽপি তস্যানিয়তত্বাৎ প্রথমাবধেস্তু নিয়তত্বাদিতি, প্রথমাবধেঃ প্রদক্ষিণক্রমেণৈব দ্বিতীয়াদিস্থানানাং সংজ্ঞাঽস্তীতি।" মুনীশ্বরও ইহার পুনরুল্লেখ করেন, "প্রথমাবধেরভাবাৎ পরিচ্ছিন্নসংখ্যাস্থ তৎসত্ত্বে তস্যানিয়তত্বাৎ প্রথমাবধেস্তু নিয়তত্বাৎ তৎস্থানাদারভ্য স্থানসংজ্ঞাঽপসব্যক্রমেণ যুক্তত্বাৎ।" কৃষ্ণদৈবজ্ঞ মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজজ্যোতিষী ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুনীশ্বর ছিলেন সম্রাট্ শাহ্ জাহানের রাজজ্যোতিষী।

এক হইতেই সংখ্যা গণনার আরম্ভ। নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাঙ্ক একস্থানব্যাপী বা একপদ। তৎপরে দশ হইতে নিরানব্বই পর্য্যন্ত সংখ্যা দ্বিস্থানাবচ্ছিন্ন বা দ্বিপদ। তাহাদের নামও দুই শব্দের সমাহারে নিষ্পন্ন। সুতরাং গণনা স্বভাবতই এককস্থান হইতে আরম্ভ। দশক, শতক প্রভৃতি স্থান স্বভাবতই পর্য্যায়ক্রমে পরে আসে।

সংখ্যা নামকরণে বিশেষ বিধি

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুই একটি ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সভ্য জাতির ভাষায় দ্বিপদ সংখ্যার নামকরণে অর্থাৎ সংখ্যাজ্ঞাপক-বাক্য-নির্ম্মাণে উপচীয়মানক্রম এবং ততোঽধিক পদ সংখ্যার নামকরণে অপচীয়মানক্রম সাধারণ বিধিরূপে অনুসৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ বিষয়ে দুই একটা বিশেষ বিধিও ছিল। সেগুলি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ সমাধানের জন্য তাহাদের প্রয়োজনও আছে। কখন কখন শতাধিক সংখ্যার নামকরণেও ছোট সংখ্যাটা পূর্ব্বে বসিত। যথা,—১০৮০০ সংখ্যার উল্লেখ করিতে শতপথ-ব্রাহ্মণ১ লিখিয়াছে—"অষ্টাশতং শতানি"। ঐ স্থলে অষ্টাশতং = ১০৮। ঐ ব্রাহ্মণে আরও পাওয়া যায়—"অশীতিশতম্" = ১৮০ (১০।৪।২।৬); চতুশ্চত্বারিংশং শতম্" = ১৪৪ (১০।৪।২।৭); "বিংশতিশতম্" = ১২০ (১০।৪।২।৮); "অষ্টাত্রিংশং শতম্" = ১৩৮ (১০।৪।৩।১৮)। বেদে ও ব্রাহ্মণে "একশতং" = ১০১, এই প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।২ ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। তাহাদের জন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—

"তদ্ অস্মিন্ন অধিকম্, ইতি দশান্তাড ডঃ" ৩

যথা,—'একাদশং শতম' (= ১১১), 'দ্বাদশং শতম' (= ১১২), 'শতসহস্রম' (= ১১০০)।

"শদ্-অন্ত-বিংশতেশ্চ" ৪

যথা,—'বিংশং শতম্' (= ১২০), 'ত্রিংশং শতম্' (= ১৩০), 'চত্বারিংশং সহস্রম' (= ১০৪০)।

"ত্রেস্ ত্রয়ঃ"৫

যথা,—'ত্রিশতম্' (= ১০২), 'অষ্টসহস্রম্' (= ১০০৮) ইত্যাদি।

জৈনাচার্য্য জিনভদ্রগণির লেখায় আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। তিনি কখন কখন নিয়তরূপে উপচীয়মানক্রমে সংখ্যোল্লেখ করিতেন। যথা,—

"সত্ত হিয়া তিন্নিসয়া বারস য সহস্স পংচ লক্‌খা য" ।৬
এগসত্তরি নব সয় ছপ্পন্ন সহস্স চউদ্দশ ব,
লক্‌খা দু কোড়ি...,"৭।

১। ১০।৪।২।২৩, ২৪ ; আরও, "শতংশতানি পুরুষঃ সমেনাষ্টৌ শতা যন্মিতং তদ্বদন্তি"—১২।৩।২।৮।

২। অথর্ব্ববেদ, ৩।৯।৬ ; ৫।১৮।১২ ; শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১০।২।৬।১০ ; ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮।১১।৩ ; প্রশ্নোপনিষদ্, ৩।৬ ; বোধায়ন শুল্বসূত্র, ২।৪৬

৩। ৫।২।৪৪

৪। ৫।২।৪৫

৫। ৬।৩।৪৮

৬। বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১।৮১

৭। ঐ, ১।৯১

আরবী ভাষায়ও কখন কখন এই প্রকার উপচীয়মানক্রমে সংখ্যা জ্ঞাপন হইত। এগুলিকে গণিতশাস্ত্রের সাধারণ বিধি বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহারা কদাচিৎ অনুসৃত হইত। সুতরাং লোক-ব্যবহার মাত্র।

সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দের খাতিরে কখন কখন মিশ্রক্রমেও সংখ্যা উল্লিখিত হইত, যথা,—ঋগ্বেদে[১] আছে, দেবতার সংখ্যা—

"ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণি···ত্রিংশচ্চ···নব চ,"

বৃহদ্দেবতায়[২] ইহাকে বলিয়াছে,—

"ত্রীণি সহস্রাণি নব ত্রীণি শতানি চ"

উহার অন্যত্র আছে,[৩] ঋচের সংখ্যা,—

"নবনবতিঃ পঞ্চলক্ষা ঋচঃ স্যাচ্চতুঃ শতম্"

অঙ্কপাতে বামাগতি—উৎপত্তিকাল

পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হিন্দুর নামসংখ্যা-প্রণালী[৪] ও অক্ষর-সংখ্যা বা বর্ণ-সংখ্যা-প্রণালী[৫] মতে সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক নামের বা অক্ষরের বিবক্ষিত সংখ্যাঙ্ককে বামাগতিতে বিন্যাসের প্রথাও প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল বাক্য সব্যক্রমেই লিখিতে হয়। অথচ বাক্য-বোধিত সংখ্যাকে অপসব্যক্রমে অঙ্কে পাত করিতে হয়। বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, শককালের সঙ্গে "ষট্ত্রিকপঞ্চদ্বি" বৎসর যোগ করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনকাল পাওয়া যায়।[৬] বামাগতিতে ঐ সংখ্যা হয় ২৫২৬ এবং তাহাই উদ্দিষ্ট সংখ্যা। ষড়্গুরুশিষ্য কলির "খগোস্ত্যাম্নেষমাপ"[৭] দিন গতে তাঁহার 'বেদার্থদীপিকা' রচনা শেষ করেন। কটপয়াদি মতে খ = ২, গ = ৩, য = ১, ম = ৫, ষ = ৬ ও প = ১; ঐ বাক্যে ন্ ও ত্ নিরর্থক, সুতরাং বাক্য-বোধিত সংখ্যা ১, ৫৬৫, ১৩২। অঙ্কপাতে বামাগতি প্রবর্ত্তন কত কালের? নাম-সংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি প্রয়োগের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়, বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' ও 'বৃহৎসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার রচনা-কাল ৪২৭ শক (= ৫০৫ খ্রীষ্ট-সাল)। তাহার পূর্ব্বেকার 'মূলপুলিশ-সিদ্ধান্ত' এবং 'অগ্নিপুরাণে'ও যে বামাগতিতে নাম-সংখ্যা প্রযুক্ত হইত, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আধুনিক বিদ্বৎসমাজে মতভেদ আছে বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক হইতে নাম-সংখ্যা বামাগতিতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি

১। ৩।৯।৯ ; ১০।৫২।৬

২। ৭।৭৫

৩। ৩।১৩০

৪। এই বিষয়ে আমরা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি ;—(১) "শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী" (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮-৩০ পৃষ্ঠা) ; (২) "নাম-সংখ্যা" (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭--২৭ পৃষ্ঠা) ; (৩) "জৈন সাহিত্যে নাম-সংখ্যা" (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২৮--৩৯ পৃষ্ঠা ১)।

৫। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০ পৃষ্ঠা, বিশেষ দ্রষ্টব্য ৩৫ ও ৩৭ পৃষ্ঠা।

৬। 'বৃহৎসংহিতা', সপ্তর্ষিচার, ৩ শ্লোক।

৭। পূর্ব্বপ্রবন্ধে মুদ্রাকর-দোষে 'খগোস্ত্যাম্নেষাপ' বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। উহা অশুদ্ধ।

প্রবর্ত্তনের কাল এখনও সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হয় নাই। প্রাচীন টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা মনে করিতেন যে, কটপয়াদি প্রণালী (প্রথম) আর্য্যভটের (৪৯৯ খ্রীষ্ট-সাল)ও পূর্ব্বেকার। তিনি ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা উহার স্বল্পকাল পরের। প্রথম আর্য্যভটের শিষ্য ভাস্কর (প্রথম)[১] স্বপ্রণীত 'লঘু-ভাস্করীয়' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের এক স্থলে উহার প্রয়োগ করিয়াছেন।[২] যথা—'মন্দ' = ৮৫, 'বৈলক্ষ্য' = ১৩৪, 'বাগ' = ৩২, 'নর' = ২০, 'সাগর' = ২৩৫ ইত্যাদি। ঐ গ্রন্থের রচনা-কাল 'বাভাব' (= ৪৪৪) শক (= ৫২২ খ্রীষ্ট-সাল)।[৩] ইহার পরের প্রমাণ দশম খ্রীষ্ট-শতকের।[৪] মধ্যবর্ত্তী কালে কটপয়াদি প্রণালী প্রয়োগের কোন দৃষ্টান্ত এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।[৫]

দক্ষিণাগতি

১২০০ খ্রীষ্ট-সালের সমীপবর্ত্তী কালে টীকাকার আমরাজ লিখিয়াছেন,—"গণিত-গ্রন্থাদিতে সর্ব্বত্র অঙ্কবিন্যাস অপ্রাদক্ষিণ্যক্রমে কর্ত্তব্য।"[৬] তিনি 'সর্ব্বত্র' বলিয়া জোর

১। ইনি 'লীলাবতী', 'বীজগণিত' ও 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ভাস্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি,—ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

২। "বাভাবোনাচ্ছকাব্দাদ্ধনশকলযাহান্মন্দবৈলক্ষ্যবাগৈঃ।
প্রাপ্তাভির্লিপ্তিকাভির্বিরহিততেনবশ্চন্দ্রতুঙ্গপাতাঃ॥
শোভানীত্রাদসংবিদ গণকনবহতান্মাগবাপ্তাঃ কুজাদ্যাঃ।
সংযুক্তাস্তবসৌবাসৃস্থবগুরুভৃগুজৌভানুবর্জ্জ······॥"—'লঘুভাস্করীয়', ১।১৮

এই গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। মান্দ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগারে উহার এবং ভাস্করের অপর গ্রন্থ 'মহাভাস্করীয়ে'র পাণ্ডুলিপি আছে। লেখক ঐ দুই গ্রন্থের প্রতিলিপি আনাইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই শ্লোকের মৌলিকতা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সন্দিহান। তিনি মনে করেন যে, উহা টীকাকারবিশেষের। কারণ,সেই টীকা দেখিলে উহাই মনে হয়। এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

৩। ভাস্কর কোথাও আপনাকে কটপয়াদি প্রণালীর প্রবর্ত্তক বলেন নাই। অন্যত্রও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি প্রবর্ত্তক হইলে, তাঁহার গ্রন্থে উহার ব্যাখ্যা থাকিত। সুতরাং কটপয়াদি প্রণালী তাঁহার পূর্ব্বেকার। ইহাতে সূর্য্যদেব যজ্বার কথাই সমর্থিত হয়। হয় ত ভাস্করের গ্রন্থ দৃষ্টে, তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি মহাভাস্করীয়ের টীকা লিখিয়াছিলেন, জানা যায়।

৪। জৈনাচার্য্য নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—
"তললীনমধুগাবিমলং ধমুসিলা গাবিচোরভয়মেরূ,
তটহরিখঝসা হোংতি হু মানুস পজ্জত্ত সংখাকা॥"—গোম্মটসার, জীবকাণ্ড, ১৫৮ গাথা।

"মানুষের সংখ্যা ৭৯, ২২৮, ১৬২, ৫১৪, ২৬৪, ৩৩৭, ৫৯৩, ৫৪৩, ৯৫০, ৩৩৬।" অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, 'রাগ' = ৩২ (৪৪ গাথা)। তিনি ৯৭৫ খ্রীষ্ট সালে জীবিত ছিলেন। নেমিচন্দ্র দক্ষিণাগতিক্রমেও অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ করিতেন, যথা—
"বটলবণরোচগোনগনজরনগংকাসসসঘধমপরকধরং।
বিগুণণবস্থস্নসহিদং পল্লসৃস রোমপরিসংখ্যা॥"---ত্রিলোকসার, ৯৮ গাথা।

উদ্দিষ্ট সংখ্যা,— ৪১৩, ৪৫২, ৬৩০, ৩০৮, ২০৩, ১৭৭, ৭৪৯, ৫১২, ১৯২, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০। এই প্রকার দৃষ্টান্ত তাঁহার গ্রন্থে আরও আছে (গোম্মটসার, জীবকাণ্ড, ৩৬০, ৩৬৩-৪ গাথা দ্রষ্টব্য)। নেমিচন্দ্রের অনুসৃত অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার টোডরমলজী (১৭৬২ খ্রীষ্ট-সাল) একটা প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা উল্লেখযোগ্য,---
"কটপযপুরস্থবর্ণৈর্নবনবপঞ্চাষ্টকল্পিতৈঃ ক্রমশঃ।
স্বরঞনশূন্যং সংখ্যামাত্রোপরিমাক্ষরং ত্যাজ্যং॥"

৫। প্রথম আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিতে ব্রহ্মগুপ্ত ও পৃথূদকস্বামী তৎপ্রবর্ত্তিত অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীরও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সেই প্রকার উল্লেখের কথা বলিতেছি না।

৬। "অঙ্কবিন্যাসশ্চ গণিতগ্রন্থাদিষু সর্ব্বত্রাপ্রাদক্ষিণ্যেনৈব যোজ্যঃ।" আমরাজ বা আমশর্ম্মা, ব্রহ্মগুপ্ত-

দিয়া ঠিক করেন নাই। কারণ, কি নাম-সংখ্যা, কি অক্ষর-সংখ্যা, উভয় প্রণালীরই সংখ্যা-জ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে কখন কখন দক্ষিণাগতিও অনুসৃত হয়, দেখা যায়। অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে দক্ষিণাগতি প্রয়োগের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে দ্বিতীয় আর্য্যভটের গ্রন্থে,—দশম খ্রীষ্ট-শতকের মধ্যভাগে। নাম-সংখ্যা-প্রণালীতে তাহার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে, ষষ্ঠ খ্রীষ্ট-শতকের তৃতীয় পাদে রচিত জিনভদ্রগণির 'বৃহৎক্ষেত্রসমাসে'। তাহারও বহু পূর্ব্বের প্রমাণ আছে বাক্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে। উহা খ্রীষ্ট-সালের প্রারম্ভ-কালের লেখা।[১] সুতরাং সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে কাহার প্রয়োগ পূর্ব্বেকার, বামাগতি, কি দক্ষিণাগতি, তাহা এখন নিরূপিত হয় নাই। যাহা হউক, অঙ্কপাতে দক্ষিণাগতি হিন্দুর লিপিক্রমের অনুকূল, সুতরাং নির্দ্দোষ। কিন্তু বামাগতি তাহার প্রতিকূল, তাই সদোষ মনে হয়। সেই হেতু স্বতই মনে জাগে, সংখ্যা-প্রণালীতে তাহা অবলম্বিত হইল কেন? স্থান-বিন্যাসে বামাগতি অনুসরণ-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে সদোষ মনে হইলেও, উহা যে প্রকৃত নির্দ্দোষ, তাহার হেতু আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। অঙ্কপাতে উহার কি হেতু আছে?

অঙ্কপাতে বামাগতির কারণ

অঙ্কপাতে বামাগতি অনুসরণের হেতু বিনিশ্চয় করিতে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। নাম-সংখ্যা-প্রণালী ও অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী, যাহাতে বামাগতি অথবা দক্ষিণাগতি-ক্রমে অঙ্কপাত করিতে হয়, তাহাদের উভয়ই স্থানীয়মান-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতু ঐ সকল প্রণালী অনুসারে বহুস্থানাবচ্ছিন্ন কোন বৃহৎ সংখ্যার নাম করিতে হইলে, ঐ সংখ্যার এক হইতে আরম্ভ করিয়া তদন্তর্গত প্রত্যেক অঙ্কের নাম পর পর করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাকে নেমিচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ক্রমেণাঙ্কক্রমেণৈব",[২] সেই প্রকারে। কোন সংখ্যাস্থ প্রত্যেক অঙ্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থানীয়মানের উল্লেখ থাকিলে, অথবা তাহা অন্য কোন গৌণ প্রকারে সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলে, সেই সকল অঙ্কের উল্লেখ যে কোন ক্রমেই হইতে পারে। যেমন ৫৩২০ সংখ্যাকে ৫ হাজার ৩ শ ২০, অথবা ৩ শ ৫ হাজার ২০, অথবা ২০ ৫ হাজার ৩ শ' যে কোন প্রকারেই বলা যায়। সাধারণতঃ প্রথমোক্ত প্রকার ব্যতীত অপর কোন প্রকারে বলা হয় না বটে। কিন্তু বলিলেও কোন দোষ হয় না, প্রকৃত সংখ্যাটি নির্ণয়ে কোন বিঘ্ন হয় না, তাহাই আমরা বলিতেছি। প্রথম আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে স্বরবর্ণ সহযোগে প্রত্যেক অক্ষর-সংখ্যার স্থানীয়মান নির্দ্দেশিত

প্রণীত 'খণ্ডখাদ্যক' নামক করণগ্রন্থের টীকাকার। এই টীকা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বটুআ মিশ্রের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। আমরাজের গুরুদেব ত্রিবিক্রম 'খণ্ডখাদ্যকে'র উত্তরার্দ্ধের টীকা লিখিয়াছেন। উহার করণকাল ১১০২ শক (=১১৮০ খ্রীষ্ট-সাল) (আমরাজের টীকা, ১।১২)। সুতরাং আমরাজের সময় ১২০০ খ্রীষ্ট-সালের সমীপবর্ত্তী হইবে। আমরাজের নিবাস ছিল আনন্দপুরে। উহা গুর্জ্জর প্রদেশে সবরমতী নদীতীরে অবস্থিত ছিল। তাহার অপর নাম বড়নগর।

১। Bibhutibhusan Datta, "The Bakhshali Mathematics," *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. 21, 1929, pp. 1-60; R. Hoernle, "The Bakhshali Manuscript," *Indian Antiquary*, Vol. 17, pp. 33-48, 275-9.

২। ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা।

থাকে। তাই তাহাকেও মিশ্রক্রমে বলা যায়। যেমন আর্য্যভটের মতে বুধশীঘ্রোচ্চের যুগ-ভগনসংখ্যা ১৭৯৩৭০২০। তিনি তাহাকে বলিয়াছেন 'স্থগুশিথন'। উহাকে 'গুস্থনশিথৃ' 'শিনস্থথৃগু' ইত্যাদি বহু প্রকারে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু নামসংখ্যা-প্রণালীতে ও কটপযাদি প্রণালীতে অঙ্কের স্থানীয়মান নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার কথনক্রম হইতে। তাই এক অবধি হইতে আরম্ভ করিয়া পরম্পরাক্রমে সংখ্যার উল্লেখ করিতে হয়। কোন সংখ্যার নামোল্লেখ যদি তাহার বাম অবধি হইতে হয়, তবে সেই বাক্য-বোধিত সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। অপর পক্ষে যদি দক্ষিণ অবধি হইতে সংখ্যাটির নামোল্লেখ হয়, তবে তাহাকে বামাগতিতে অঙ্কে পাত করিতে হইবে। সুতরাং অঙ্কপাত করিতে কোন্ গতি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংখ্যার নামকরণের উপর নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি যে, সংস্কৃত ভাষায় একাদশ, দ্বাদশ হইতে নবনবতি পর্য্যন্ত সংখ্যার নামকরণে লঘুসংখ্যার পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। তাহাদিগকে অঙ্কে পাত করিতে বস্তুতঃ বামাগতি অনুসরণ করিতে হয়। 'বিংশংশতম্' (১২০ অর্থে), 'দ্বাদশংশতম্' (১১২ অর্থে) প্রভৃতিও তদ্রূপ। হয় ত এই বিশেষ বিধির অনুসরণেই বহুপদ সংখ্যার ও নামকরণের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। তাহাতেই অঙ্কের বামাগতি-বিধির উৎপত্তি। এই অনুমান অসঙ্গত না হইলেও নির্দ্দোষ নহে। যাহা সাধারণ বিধি, তাহার পরিবর্ত্তে, একটা বিশেষ বিধির সুপ্রচলন হইল কেন? এই প্রশ্ন স্বতই জাগিবে। ঐ প্রকার নামকরণের কারণ অন্যও হইতে পারে। অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ আমরা সাধারণতঃ একক, দশক, শতক ইত্যাদি উপচীয়মান ক্রমেই করিয়া থাকি, অপচীয়মানক্রমে করি না। গণনায় তাহারা সেই ক্রমেই উপজাত হয়। সেই ক্রমেই তত্তৎস্থানস্থিত অঙ্কের নামের সমাহারে সংখ্যাবিশেষের নামকরণের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে, উহা খুবই স্বাভাবিক। প্রাচীন লেখক জিনসেন ঐ প্রকার একটা ইঙ্গিতও যেন করিয়াছেন। কোন একটা সংখ্যার উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"স্থানক্রমাত্রিকং দ্বেচ ষট্চত্বারি নব দ্বিকং"[১]

অর্থাৎ বক্তব্য সংখ্যাটি ৩,২,৬,৪,৯ ও ২ অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ্য; যেই ক্রমে অঙ্কস্থানের বিন্যাস হইয়া থাকে, সেই ক্রমেই এই অঙ্কগুলির বিন্যাস করিলে বক্তব্য সংখ্যাটি পাওয়া যাইবে। ইহা বলাই যেন জিনসেনের অভিপ্রায়।[২] সুতরাং উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি ২৯৪৬২৩।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

১। 'নেমিপুরাণ' বা 'জৈন হরিবংশপুরাণ', ৫ম সর্গ, ৫৫০ (?) শ্লোক। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ৭৫ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে। জিনসেন ৭০৫ শকে ঐ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

২। 'স্থানক্রম' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। উহার অর্থ 'পর পর স্থান বা 'স্থানপরম্পরা' হইতে পারে; অথবা উহা 'স্থানবিন্যাসক্রম'ও বুঝাইতে পারে। জিনসেন বস্তুতঃ কোন্ অর্থে 'স্থানক্রম' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। আমরা উহাকে শেষোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে অঙ্কপাতে বামাগতি বা দক্ষিণাগতি, যে কোনটারই অনুসরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত অর্থ স্বীকার করিলে অঙ্কপাতে বামাগতিই অনুসরণীয় হয়। বামাগতিতেই জিনসেনের বক্তব্য সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

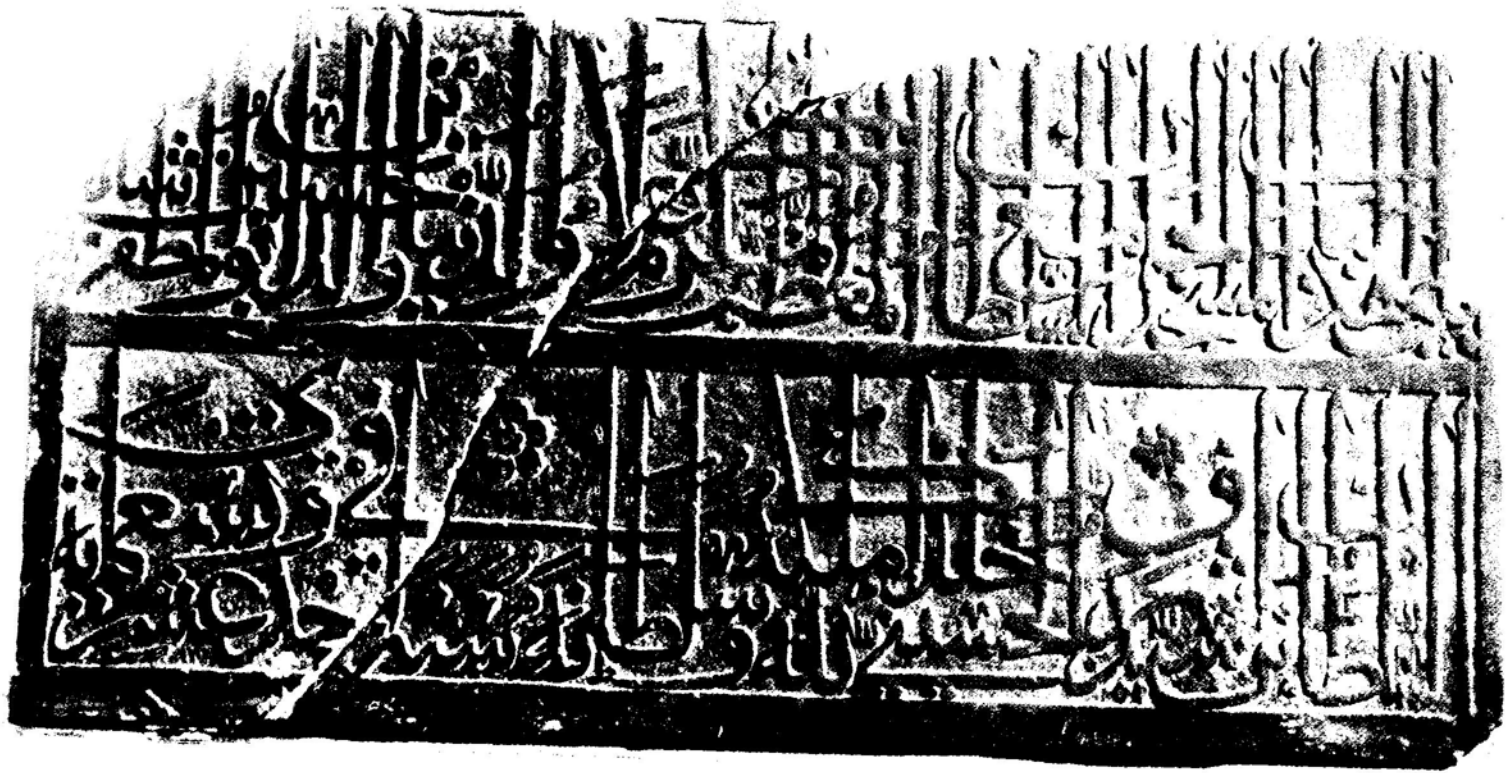

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুম্মামস্‌জিদ—তোরণ-লিপি

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুম্মামস্‌জিদ তোরণ-লিপি

হিজরী ৯১১ (খ্রীষ্টাব্দ ১৫০৫) বর্ষে উৎকীর্ণ এই শিলালিপি দ্বারা ঐ বর্ষে বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর হুসেন শাহ্‌ (৮৯৯—৯২৫ হিঃ) জুম্মা মস্‌জিদের (সম্ভবতঃ গৌড়ের) তোরণ নির্ম্মাণ করেন, ইহা প্রমাণিত হয়। এই রাজা বাঙ্গালার বিখ্যাত হুসেন-শাহী রাজবংশের (৮৯৯—৯৪৪ হিঃ) সংস্থাপক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম থানার অধীন ঝিল্লি গ্রামে ইহা আবিষ্কার করেন।* এই লিপি এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কলাশালায় শিলালিপি-সংগ্রহে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শিলালিপিটি 'ক্লোরাইট'-প্রস্তরে খোদিত। ফলকের পরিমাপ ৩´×১´-৬½´´। ফলকটি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেলেও উহার লিপি সম্পূর্ণ এবং সুরক্ষিত। লিপির প্রতিরূপ এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ এম্‌-এ মহাশয়ের সাহায্যে লিপির নিম্নোক্ত পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে,—

জুম্মা মস্‌জিদের এই তোরণ হুসেন বংশের বংশধর সৈয়দ আশ্‌রফের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিত সুলতান 'অলাউ-দ্‌-দুন্‌য়া র-দ্‌-দীন আবু-ল্‌-মুজফ্‌ফর হুসৈন্‌ শাহ্‌ নির্ম্মাণ করেন। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও রাজপদ চিরস্থায়ী করুন। ৯১১ হিজরী।

শ্রীঅজিত ঘোষ

---

* ঝিল্লি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন অধিকারী, শ্রীযুক্ত গুরুপদ অধিকারী এবং শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত অধিকারী মহাশয়গণের বাড়ীতে এই লিপিটি ছিল। তাঁহারা ইহা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের কলাশালায় দান করিয়াছেন। এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সম্পাদক

বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষ *

বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরী—এই ভাষা ছয়টিকে 'প্রাচ্য ভারতীয় আর্য্যভাষা' শ্রেণীভুক্ত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইহারা একই ভাষা-জননীর কন্যা। ইহাদের তুলনা ও ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা ইহাদের মূল প্রাচ্য অপভ্রংশের রূপ জানা যাইবে।

এই প্রবন্ধে Indicative Mood বা নির্দ্দেশ ভাবের বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

বাঙ্গালা

একবচন	বহুবচন
চলি	চলি

আসামী

চলোঁ	চলোঁ

উড়িয়া

চালেঁ, চালি	চালুঁ

মৈথিলী

চলৌঁ*	চলী, চলিঐক, চলিঔক, চলিঅহুক, চলিঅ*, চলিঐকক, চলিঔকক, চলিঐন্‌হি

মগহী

চলুঁ	চলীঁ, চলী, চলিঅইক, চলিঅউক

ভোজপুরী

চলোঁ*	চলীঁ

মন্তব্য। (১) তারকাচিহ্নিত পদগুলি সাধারণতঃ কবিতায় ব্যবহৃত হয়। (২) বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী) ভাষাগুলিতে সাধারণতঃ বহুবচনের পদগুলি একবচনে ব্যবহৃত হয়। (৩) ছোরাচিহ্নিত পদগুলি কর্ম্মের পুরুষ ও সম্মান-ভেদে প্রযুক্ত হয়। (৪) মগহী ও ভোজপুরীতে ধাতুরূপে স্ত্রী প্রত্যয় আছে। এগুলি অর্ব্বাচীন

* ১৩৩৭ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যদি এই পদগুলির ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র আধুনিক রূপ লইয়া তুলনা করা যায়, তবে ইহাদের মূল রূপ স্থির করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই জন্য ইহাদের ঐতিহাসিক বিচারের আবশ্যক।

বাঙ্গালা

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে উত্তমপুরুষের রূপগুলি এই—চলোঁ, চলো, চলী, চলি, চলিএ। ইহাতে প্রয়োগের দিক্ দিয়া সর্ব্বনামের ঐতিহাসিক বহুবচন (আহ্মে, আহ্মি, আহ্মী, আহ্মোঁ) ও একবচনের (মোএঁ, মোঞঁ, মোঞেঁ, মোঞে মোঞিঁ, মো, মোঁ, মোঁই) কোন ভেদ নাই। এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক বাঙ্গালায় একই ব্যক্তি এককালে আমি ও মুই প্রয়োগ করিলে যেমন হয়, সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ। যথা—

দূতা পাঠায়িআঁ **আহ্মে** নিব ত গোকুলে।
বাটত যাইতেঁ **মো** করিবোঁ অলঙ্কালে॥ (১২৭ পৃঃ)
পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।
চাঁচরী খেলাওঁ **মোএঁ** যমুনার কূলে॥
খেড়ী [(]খলাইএ **আহ্মে** নান্দের ঘরে।
নিন্দ না জাএ কংসরায় **মোর** ডরে॥ (৭৯ পৃঃ)

এইরূপ প্রয়োগ সর্ব্বত্র। সর্ব্বনামের এইরূপ প্রয়োগ দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যম যুগের প্রথম ভাগে **ক্রিয়াপদে** উত্তমপুরুষের কোন বচন-ভেদ ছিল না, তাহা যথার্থ হইবে না। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে নিম্নে সেই সমস্ত বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিব, যাহাতে উত্তমপুরুষের কর্ত্তৃপদগুলি উক্ত হইয়াছে:—

পাওঁ মোএঁ (১০), আসি আহ্মি (১১), বোলোঁ মো, আহ্মে জানিএ (১৩), আহ্মে পারী, জাই আহ্মে (২ বার) (১৪), মো জাণোঁ (২৪), আহ্মে রহি (৩০), আহ্মে চাহী (৩১), পুছো মোএঁ, থাকোঁ মো, জাওঁ মো, দেখোঁ মো (৩৬), আহ্মে হইএ (৪২), দেওঁ মোএ (৪৩), জাণো আহ্মে (৪৪), নহোঁ মোএ (৪৫), হইএ আহ্মে (৪২), মো জাওঁ, বোলোঁ মোএঁ (৫০), বোলোঁ মো (৫৪), আহ্মে পাইএ (৫৬), ধারো মোঁ, জাওঁ মোএঁ (৫৮), জাইএ আহ্মে (৫৯), আহ্মে জাইএ (৭০), আহ্মে জানী (৭৬), খেলাওঁ মোএ, খেলাইএ আহ্মে (৭৯), দেখোঁ মো (৮০), মোএঁ ধরোঁ (৮৫), মোঁ পোহাওঁ (৯২) জাণিএ আহ্মী (৯৭), বোলোঁ মো (৯৯), ধরো আহ্মে (১০৩), কহো মোঁ (১০৫), হইএ আহ্মে, আহ্মে করী (১০৬), হইএ আহ্মে (১০৭), করোঁ মো (১০৮), মো সাধোঁ, থাকোঁ মো, সাধোঁ মোএ (১১২), আহ্মে জাই (১১৩), জাণো মোএঁ (১১৮), বোলোঁ মোএ (১১৯), মোএঁ হরোঁ (১২৯) নারোঁ মোএঁ (১৩৫), আহ্মে জাইএ (১৪০), বোলোঁ মোএঁ (২ বার) (১৪১), মোএঁ জাণো (১৪৭), করোঁ মো (১৪৮), মো জাণো (১৫০), মো জাণো (১৫১), নারোঁ মো (১৫৪), বোলোঁ মো, আহ্মে আছি (১৫৭), আহ্মে পারী (১৬৭), দেওঁ মোএঁ (১৬৯), আহ্মে মরী, নহোঁ মোএঁ (১৭৬), জাণো আহ্মে (১৭৭), লই আহ্মে

(১৮৩), বোলোঁ মোএঁ (১৮৪), আহ্মে পারী, মো মানো, আহ্মে বহী (১৮৫), আহ্মে জাণী (১৮৮), আহ্মে সংহারী, আহ্মে নারী (১৯১), জাওঁ মো (১৯২), পারী আহ্মে (১৯৪), আহ্মে দেখী (১৯৯), আহ্মে জাণী (২০৪), ভুঞ্জোঁ মোএঁ (২১৬), করোঁ মো (২১৮), মো নাহিঁ নাশি, মো জাওঁ (২২৩) মোঞি জাণো (২২৪), আহ্মে পারী (২২৫), দেখোঁ মো (২২৬), আহ্মে তুলী (২৪১), মোএঁ ঘাটোঁ (২৪২), রাখোঁ মো (২৪৩), মোএঁ করোঁ (২৪৫), আহ্মে জাণী (২৪৯), আহ্মে নাম্বী, আহ্মে পাম্বি (২৫৪), নিষধিএ আহ্মে (২৬৪), যাওঁ মো (২৭১), হওঁ মো (২৭৫), নহোঁ মো (২৭৬), বোলোঁ মোঞ (২৮৫), মো হাণো (২৮৭), হয়িএ আহ্মে (২৮৮), মো জাণো, মো কান্দো (২৯৫), মো দেখোঁ (২৯৬), মোএঁ জাওঁ (৩০৫), শুনো মো (৩০৬), আহ্মে করি (৩১৩), মোঞঁ এড়াওঁ (৩১৫), আহ্মে জাণোঁ, পুছি আহ্মে (৩১৭), মোঞঁ নেওঁ (৩১৯), আহ্মে জাণী (৩২১), আহ্মে নীএ, বোলোঁ মো, আহ্মে জাণী (৩২২), পাওঁ মো (৩২৩), আহ্মে পাই, আহ্মে নীএ (৩২৫), দিএ আহ্মে (৩৩০), চাহোঁ মো (৩৩১), জাণো মো (৩৩৫), মোঞঁ বোলোঁ (৩৪০), জাণো মো (৩৪২), আহ্মে জাণি, বোলোঁ মো (৩৪৭), ঝুরোঁ মো, মোঞঁ মানো (৩৫০), মোঞঁ দেওঁ (৩৫১), বোলোঁ মো, করোঁ মো (৩৫৭), জীঞোঁ মোঁ (৩৬০), আহ্মে পারী (৩৬৫), করোঁ মো (৩৬৯), খোজোঁ মো, করো মো (৩৭২), আহ্মে পারী, যাঞোঁ মোঞে মোঞে, জাণ (৩৭৩), মোঁ তোলোঁ (৩৭৪), আহ্মে···চাহি (৩৭৫), চিন্তো মোঞেঁ, মোঁ করোঁ (৩৮৫), মো চাহোঁ (৩৮৬), মোঁ করোঁ (৩৯৪), বোলোঁ মো (৩৯৮)।

এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, (ঐতিহাসিক) একবচনের উদাহরণের সংখ্যা ৮৬টি। ইহার মধ্যে—

-ওঁ	বিভক্তিযুক্ত		৬৪
-ও	”		২০
-অ	”	(জাণ = জাণো)	১
-ই	”	(নাশি)	১
			৮৬

(ঐতিহাসিক) বহুবচনের উদাহরণের সংখ্যা ৫৫টি। ইহার মধ্যে

-ইএ	বিভক্তিযুক্ত		১৪
-ঈ	”		২১
-ই	”		১৬
-ও	”	(জাণো ২বার, ধরো)	৩
-ওঁ	”	(জাণোঁ)	১
			৫৫

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ক্রিয়ার উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের পৃথক্ রূপ ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভিন্ন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি মধ্যযুগের পুস্তকে উত্তম

পুরুষের বিভক্তি -ও, -ওঁ, -ইএ (-ইয়ে), -ই দেখা যায়। কিন্তু সেখানে সাধারণতঃ (ঐতিহাসিক) একবচন বহুবচন-নির্ব্বিশেষে এই বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। মধ্যযুগের আদিতে উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি যে -ওঁ এবং বহুবচনের বিভক্তি যে -ই ছিল, তাহা বাঙ্গালার কয়েকটি বর্ত্তমান dialect বা বিভাষা হইতে নিশ্চিত বোধ হইবে :—

পশ্চিম বিভাষা—সরাকী উপভাষা

একবচন	বহুবচন
মুঁই করুঁ	হামরা করি

উত্তর বিভাষা—কোচ-মিশ্রিত উপভাষা

মুই পাও	মোরা করি

রাজবংশী বিভাষা—রঙ্গপুরী উপভাষা

মুঁই করোঁ	হাম্‌রা করি

—জলপাইগুড়ী উপভাষা

মুই করঁ	হাম্‌রা করি

—কোচবিহারী উপভাষা:

মুঁই মরোঁ	আমরা করি

—গোয়ালপাড়া উপভাষা

মুঁই করোঁ	আমরা করি

দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিভাষা—চাক্‌মা উপভাষা

মুই গরং	আমি গরি

—সিল্‌হেটী উপভাষা

মুই যাওঁ, যাউঁ, যাউ	আমি যাই

আসামী

বর্ত্তমান আসামী ভাষায় ক্রিয়ার উত্তমপুরুষে কোন বচনভেদ না থাকিলেও মধ্যযুগের প্রথমে ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পীতাম্বর দ্বিজের উষার বিবাহ (১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ), ভট্টদেবের (১৫৫৮—১৬৩৮) কথাভাগবত ও কথাগীতা, নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (১৭ শতক) প্রভৃতি পুস্তকে 'আমি করি' ইত্যাদি রূপ পাওয়া যায়। নিম্নে কথা-গীতা হইতে উদাহরণ দিতেছি :—

আমি করিছি (২ পৃষ্ঠা) ; আমরা করি, আমি ন করি (৮) ; আমি দেখি, আমি শুনিছি, মঞি রহোঁ, আমি করি (৯) ; মঞি নহোঁ (১১) ; মঞি ন করো (১২), আমি ন পারি (২০) ; মঞি কহিছোঁ (২ বার), মঞি ন কহোঁ (২২) ; মঞি ঝরোঁ (২৫), মঞি করো, মঞি ন করোঁ (২৬), মঞি কহিছোঁ, মঞি জানো (২৯), মঞি ধরো, (২ বার), মঞি করো, মঞি করোঁ (৩০) ; মঞি সৃজিছোঁ (৩১) ; মঞি ন কহোঁ (৩৮) ;

মঞি ন করো (৩৯) ; মঞি নহোঁ, মঞি করোঁ (৪৭) ; মঞি আছোঁ, মঞি ন রহো (৫১) ; মঞি করোঁ (২ বার), মঞি ধরিছোঁ (৫৩) ; মঞি নহোঁ, মঞি জানো (৫৪), মঞি হঞো (৫৭) ; মঞি আছোঁ (৬৮) ; মঞি নাহি কঞো, মঞি ধরো, মঞি থাকোঁ, মঞি ভ্রঙ্গো, মঞি ভ্রজাঞু (৬২) ; মঞি করো (৬৪) ; মঞি দেঞু, মঞি করো (৬৫) ; মঞি করো (৬৬) ; মঞি হঞু (৬৯) ; মঞি দেঞু, মঞি করো (৭০) ; মঞি আছোঁ (৭১) ; মঞি ধরিছোঁ (৭৩) ; মঞি ধরিছো, মঞি করো, মঞি হঞু (৭৫) ; মঞি প্রবর্ত্তিছোঁ (৭৮) ; মঞি পাঞো (৭৯) ; মঞি করোঁ (৮৪) ; মঞি হঞো (৮৭) ; মঞি কহো (৮৮) ; মঞি করোঁ (৯৪) ; মঞি ধরোঁ, মঞি থাকি, মঞি হুয়াছোঁ (১০০) ; মঞি অতিক্রমিছো, মঞি হুয়াছোঁ (১০১) ; মঞি হঞো (১০২) ; মঞি পেহ্লাঞু (১০৪) ; মঞি কহো (১০৭) ; মঞি করোঁ (১১,৯) ; মঞি যাঞু (১২০) ।

এই ৬৯টি দৃষ্টান্তের মধ্যে কেবল **'মঞি থাকি'** (১০০ পৃঃ) স্থানে একবচনে -ই বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থলে একবচনে -**ওঁ**, -**ও**, -**ঞো** (= -**ওঁ**), -**ঞু** (= -**উঁ**) ও বহুবচনে -**ই** বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাই যে মধ্যযুগের আসামী ভাষার আদি প্রয়োগ, তাহা আসামীর বিভাষা হইতে প্রমাণিত হয়।

ময়াং বিভাষা

একবচন	বহুবচন
মি অছু (= *osu*)	আমি অছি (= *osi*)

আসামীর এই প্রয়োগ বাঙ্গালার মধ্যযুগের আদি প্রয়োগের সহিত অভিন্ন।

উড়িয়া

পূর্ব্ব-ভারতীয় নব্য আর্য্যভাষাশ্রেণীর মধ্যে উড়িয়া অনেক বিষয়ে রক্ষণশীল। ইহাতে ক্রিয়ায় উত্তমপুরুষের বচনভেদ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা মধ্যবাঙ্গালা ও মধ্যআসামীর একবচন ও বহুবচনের যে বিভক্তিগুলি নির্ণয় করিয়াছি, তাহার সহিত উড়িয়ার একবচন ও বহুবচনের বিভক্তির মিল নাই। পরে আমরা ইহাদের মূল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মৈথিলী

মৈথিলীর একবচনের বিভক্তি -**ওঁ** মধ্যবাঙ্গালা ও মধ্যআসামীর একবচনের বিভক্তির সহিত অভিন্ন। বহুবচনে **চলী** ভিন্ন অন্য পদগুলি মৈথিলীর আধুনিক বিশেষ রূপ। অতএব বহুবচনের বিভক্তি -**ঈ**। ইহার সহিত বাঙ্গালা ও আসামীর মিল আছে।

মগহী

মগহীর একবচনের বিভক্তি -**উঁ** ও বহুবচনের বিভক্তি -**ঈ**, -**ঈঁ**। বহুবচনের অন্য বিভক্তিগুলি আধুনিক বিশেষ রূপ।

ভোজপুরী

ইহাতে একবচন ও বহুবচনের বিভক্তির পার্থক্য আছে।

এক্ষণে আমরা এই ভাষা ছয়টির উত্তমপুরুষের বিভক্তিগুলির মূল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

বৌদ্ধগান ও দোহার চর্য্যাগুলিতে উত্তমপুরুষের বিভক্তিগুলি *(১) এই—

-(অ)মি (যেমন, জীবমি, জানমি ইত্যাদি)

-হুঁ (যেমন, দেহুঁ, লেহুঁ, অচ্ছহু = অচ্ছহুঁ, জাণহু ইত্যাদি)

-ম (যেমন, অচ্ছম, চাহাম)

ইহাদের মধ্যে একবচনের বিভক্তি -(অ)মি এবং বহুবচনের বিভক্তি -হুঁ, -ম। চর্য্যার দুই স্থানে সর্ব্বনামের উত্তমপুরুষের বহুবচনের সহিত -হুঁ বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদের অন্বয় হইয়াছে (১২ ও ২২ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য)।

অপভ্রংশে উত্তমপুরুষের বিভক্তি এই—

একবচন	বহুবচন
-(অ)মি (প্রাকৃত)	-হুঁ
-(অ)উঁ	-(অ)ম (প্রাকৃত)
	-(আ)ম („)

একবচন

প্রাচ্য অপভ্রংশ চলমি ⊱ * চলরিঁ ⊱ চলই (মধ্যউড়িয়া) ⊱ চলেঁ, চালেঁ (উড়িয়া)। এখানে উড়িয়ার সহিত মারাঠীর মিল আছে।

প্রাচ্য অপ. চলমি ⊱ চলম (আদিম মধ্যবাঙ্গালা), যেমন প্রাচ্য অপ. করন্তি ⊱ করন্ত (মধ্যবাঙ্গালা)। তৎপরে চলম ⊱ * চলরঁ ⊱ * চলওঁ ⊱ চলোঁ (মধ্যবাঙ্গালা ও বিভাষা)। *(২) এইরূপে আসামী চলোঁ। আধুনিক আসামীতে আদিম একবচনের রূপ একবচন ও বহুবচনে অভেদে ব্যবহৃত হইতেছে। অন্য পক্ষে আমরা পরে দেখিব যে, সাধু বাঙ্গালায় আদিম বহুবচনের রূপ একবচন-বহুবচন-নির্বিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে।

প্রাচ্য অপ. চলমি ⊱ * চলম ⊱ *চলরঁ ⊱ চলওঁ (= চলঞো বিদ্যাপতি পদাবলী নং ৩০, ২৮৮, ৫৯৪ ইত্যাদি ; কীর্ত্তিলতা, ২ পৃষ্ঠা) ⊱ চলোঁ (মৈথিলী, ভোজপুরী)। এই দুই ভাষায় উত্তমপুরুষের একবচন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

---

*(১) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে ৩৩ সংখ্যক চর্য্যার আবেশী পদকে উত্তমপুরুষে প্রযুক্ত মনে করিয়াছেন। টীকায় আবিশতি। আমরা ইহাকে কর্ম্মণি প্রয়োগ (= আবিশ্যতে) মনে করি। পরে দ্রষ্টব্য। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ৩৯ নং চর্য্যার বিরহুঁ ঈ পাঠস্থানে বিহরঈ পড়িতে চান। আমরা বিরহুঁ ঈচ্ছন্তেঁ স্থানে বিহরহুঁ (বিহরহুঁ) স্বচ্ছন্দেঁ পড়িতে চাই। (The Origin and Development of the Bengali Language, ৯৩১ পৃঃ)

*(২) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যুৎপত্তি হিসাবে চলোঁ পদকে বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত এবং চলি পদকে একবচনের বিভক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, ঐতিহাসিক বিচার তাঁহার মতের বিরুদ্ধ। এই জন্য আমরা তাঁহার ব্যুৎপত্তি গ্রহণে অক্ষম। (প্রাগুক্ত, ৩৫১, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৯৩৪ পৃঃ)

প্রাচ্য অপ. চলউ > * চলুঁ > চলুঁ (মগহী)। মূলতঃ প্রাচ্য অপ. চলউ অনুজ্ঞার উত্তমপুরুষের একবচন। মূল বিহারীতে চলুঁ অনুজ্ঞায় প্রযুক্ত হইত। ইহার প্রমাণ এই যে, মৈথিলীতে উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞায় চলুঁ হয় (পরে দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য বিহারী ভাষায় অনুজ্ঞা ও নির্দ্দেশ (Indicative Mood) প্রয়োগ এক। এমন কি, মৈথিলীতে এই এক মাত্র পদ ভিন্ন সমস্ত পুরুষে ও বচনে উভয় প্রয়োগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মগহীর উত্তমপুরুষের একবচনে নির্দ্দেশ প্রয়োগের পদটি লুপ্ত হইয়া তাহার স্থান অনুজ্ঞার পদ অধিকার করিয়াছে। বিহারীর কয়েকটী বিভাষায় দুই পদই নির্দ্দেশ ভাবের উত্তমপুরুষের একবচনে দেখা যায়; যেমন—

মৈথিলী-ভোজপুরী বিভাষা

চলু, চলোঁ

দক্ষিণ-মৈথিলী বিভাষা

চলুঁ, চলোঁ

দক্ষিণ-মৈথিলী-মগহী বিভাষা

চলুঁ, চলোঁ

মৈথিলী-বাঙ্গালা বিভাষা

চলুঁ, চলোঁ

দুই পদ একই কথ্য বিভাষায় থাকায় চলো হইতে চলুঁ উৎপন্ন নহে কিংবা দুইয়ের ব্যুৎপত্তি এক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অবশ্য শাব্দিক পরিবর্ত্তন (phonetic change হিসাবে চলুঁ < চলোঁ অসম্ভব নহে। যখন আমরা ব্যুৎপত্তি বিচার করিব, তখন দৃষ্ট হইবে যে, অপ. চলউ প্রাকৃত অনুজ্ঞার পদ হইতেই উৎপন্ন। নেপালী, হিন্দী, গুজরাতী প্রভৃতি কতিপয় নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষার বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষের একবচন এই অপ. চলউ হইতে উৎপন্ন।* (৩) অন্যদিকে বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়ায় ইহা হইতে ব্যুৎপন্ন কোন পদ নাই। বিহারী ভাষাগুলি মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করায় তাহাতে উভয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশিত।

উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের চালি পদের ব্যুৎপত্তি বিতর্কশূন্য নহে। শাব্দিক পরিবর্ত্তনের দিক্ দিয়া প্রাচ্য অপ. চলমি > * চলম্বি > চলই > চলই > চলি, চালি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত। কিন্তু একই সময়ে চলই > চলোঁ এবং চলই > চলি—এই বিভিন্নরূপ স্বরসন্ধির উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। আমরা এক্ষণে বহুবচন সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইবে।

* (৩) দ্রষ্টব্য—A. F. R. Hoernle প্রণীত A Comparative Grammar of the Gaudian Languages (৩৩৪, ৩৩৫ পৃঃ)। মাগধীতে অনুজ্ঞার উত্তম পু. ১ব. -উঁ হয়।

বহুবচন

প্রাচ্য অপ. চলহুঁ > * চলউঁ > চলুঁ, চালুঁ (উড়িয়া)। মধ্যবাঙ্গালায় চলহুঁ এইরূপ -হুঁ বিভক্তিযুক্ত উত্তমপুরুষের পদ ছিল। উড়িয়ার -উঁ বিভক্তি -অমু -অমো অম হইতে আসিতে পারিত। কিন্তু কোন পূর্ব্ব-ভারতীয় আর্য্যভাষার মধ্য বা নব্য যুগে বহু ব. -(অ)ম, -(অ) মো, -(অ)মু বিভক্তি হইতে ব্যুৎপন্ন কোন বিভক্তি নাই।* (৪) নব্য বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার উত্তমপুরুষের বহুবচনের ইতিহাস অন্যরূপ।

বৌদ্ধগান ও দোহার চর্য্যাপদে কর্ম্ম বা ভাববাচ্যে বর্ত্তমানের প্রথমপুরুষের একবচনের বিভক্তি—

-(হি)অই (যেমন, করিঅই, মরিঅই, চর্য্যা ১; পাবিঅই, ভাবিঅই, ২৬; ইত্যাদি)

-(হি)এ (যেমন, দুহিএ, চর্য্যা ৩৩)

-ঈ (যেমন, দেখী, চর্য্যা ১৬; জাণী, বখাণী, ২৯, ৩৭; আবেশী, ৩৩; ইত্যাদি)

এতদ্ভিন্ন অন্য রূপ আছে, তাহা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

অপভ্রংশে এই -(হি)অই বিভক্তি দেখা যায়; যথা, বান্ধিঅই (হেমচন্দ্র ৮।৪।৩৪৫); ভরিঅই (হেম ৪।৮।৩৮৩); মাণিঅই (হেম ৪।৮।৩৮৮)।

কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রথমপুরুষে মধ্যবাঙ্গালায় -ইএ, -ঈ বিভক্তি, মধ্য-উড়িয়ায় -ইই, -ই বিভক্তি, এবং মধ্যমৈথিলীতে -ইঅ বিভক্তি পাওয়া যায়।* (৫)

মধ্যআসামীতে এইরূপ স্থলে -ই বিভক্তি দেখা যায়। "পরম কামুক তুমি ত্রিভুবনে জানি" (উষার বিবাহ, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ৪২৫ পৃঃ); "একে একে যুঝিলে রথী বুলি" (কথাগীতা, পৃঃ ৫); "যি এমনে ন জানে তাক দুষ্মতে কহি" (ঐ, ১১৪ পৃঃ); "যেন অগ্নি শীতাদি নিবৃত্তির অর্থে সেবা করি" (ঐ, ১১৭ পৃঃ) ইত্যাদি।

বাঙ্গালার উত্তমপুরুষের বিভক্তি, মধ্যআসামীর উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি, উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি -ই, এবং বিহারীর উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি -ঈ এই কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বিভক্তি হইতে অভিন্ন। ইহাতে তাহাদের ব্যুৎপত্তি সূচিত হইতেছে। আধুনিক গুজরাতী ও পঞ্জাবীতেও উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তির এই রূপ; গুজ. অমে চালীএ, পঞ্জা. অসীঁ চলিএ, = মধ্যবাঙ্গালা আহ্মে চলিএ, = আধুনিক বাঙ্গালা আমি চলি।* (৬)

কীর্ত্তিলতায় -ইঅ বিভক্তি উত্তমপুরুষের একবচনের সহিত অন্বিত হইয়াছে, যথা, মন্দ করিঅ হঞো (= হওঁ = অপ. হউঁ; ৭ পৃঃ)। মৈথিলীর এই প্রাচীন প্রয়োগ এবং আধুনিক উড়িয়ার প্রয়োগ হইতে অনুমান করা যাইতে

* (৪) উড়িয়ার বহুবচনের -উঁ বিভক্তির সহিত মারাঠী ও সিন্ধীর -উঁ এবং নেপালীর -অউঁ তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিভক্তিগুলির ব্যুৎপত্তি উড়িয়ার সহিত এক কি না, তাহা এখানে আলোচনা করা অনাবশ্যক।

* (৫) দ্রষ্টব্য—The Origin and Development of the Bengali Language, ৯১৩–৯১৭ পৃঃ।

* (৬) Beames, Hoernle, J. Bloch প্রভৃতি সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক -ই বিভক্তিকে উত্তমপুরুষের একবচনের চিহ্ন মনে করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঠিক হয় নাই। একমাত্র Grierson -ওঁ বিভক্তিকে একবচন এবং -ই, -ঈ বিভক্তিকে বহুবচন স্থির করিয়াছেন।

পারে যে, মূলতঃ প্রাচ্য অপ. -(ই)অই, -ঈ উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের সহিত ব্যবহৃত হইত। আধুনিক উড়িয়ার একবচনে দুই প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু বহুবচনের প্রয়োগে প্রাচ্য অপ. উত্তমপুরুষ বহুবচনের -হুঁ বিভক্তির নিকট ইহা পরাজিত হইয়াছে; অন্য পক্ষে নব্য বাঙ্গালা, মধ্য আসামী ও নব্য ও মধ্য বিহারী ভাষাসমূহে ইহা -হুঁ বিভক্তিকে বহিষ্কৃত করিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য অপ. উত্তমপুরুষ একবচন -(অ)মি বিভক্তির দ্বারা স্বয়ং বিতাড়িত হইয়াছে।

প্রাচ্য অপ. চলিঅই > চলিএ (ম. বাং) > চলী, চলি (মধ্য এবং নব্য বাং)। যেমন অসমাপিকা চলিআ, চলিঅ, চলি—তিন পদই চর্য্যাসমূহে দেখা যায়, সেইরূপ আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, চলিঅই, চলিএ, চলী তিন পদই চর্য্যায় পাওয়া যায়। এইরূপে মধ্যবাঙ্গালায়ও চলিএ চলী চলি—তিন পদই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক বাঙ্গালায় **চলিএ** মৃত হইয়াছে।

প্রাচ্য অপ. চলিঅই > চলিঅ (মধ্য মৈথিলী) > চলী (নব্য মৈথিলী)। মগহীতে অতিরিক্ত চলী আছে। ভোজপুরীতে কেবল চলীঁ। উত্তমপুরুষের একবচনের আনুরূপ্যে (analogy) বহুবচনও সানুনাসিক হইয়াছে। অন্য পক্ষে এই আনুরূপ্যবশতঃ মৈথিলীর অনুজ্ঞার উত্তমপুরুষের একবচন অনুনাসিকবিহীন হইয়াছে (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

সংক্ষিপ্ত-সার

নির্দ্দেশ ভাব (Indicative Mood)

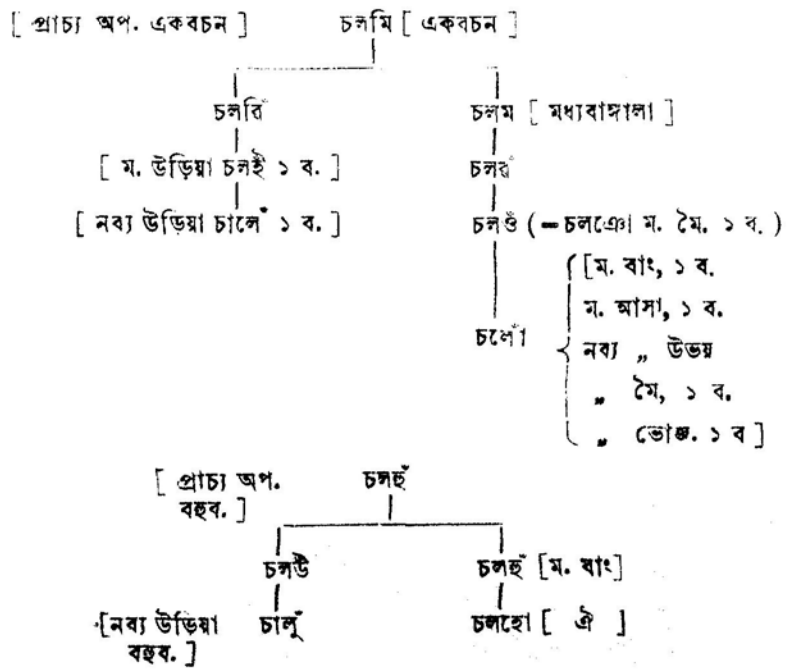

অনুজ্ঞা ভাব

[প্রাচ্য অপ. ১ ব.] চলমু
|
* চলর
|
[নব্য প্রাচ্য অপ. ১ ব.] চলউ
|
[নব্য মগহী ১ ব. চলুঁ
নির্দ্দেশ ও অনুজ্ঞা] |
[নব্য মৈথিলী ১ ব. অনুজ্ঞা] চলু

চলিমু [প্রাচ্য অপ. বহুব.]
|
* চলির
| (৭)
চলিউঁ [ম. বাং বহুব. অনুজ্ঞা]
| (৮)
চলিউ [ঐ]

কর্ম্মবাচ্য (বা ভাববাচ্য)

[প্রাচ্য অপ. ১ব.] চলিঅই

প্রা. অপ. ১ম পু. ১ ব. কর্ম্ম ব্য. চলিএ
মধ্য বাং. " উভ ব. "
" উত্তম পু. বহু ব. কর্ত্তৃ বা.]
|
[পূর্ব্বের ন্যায়] চলী
|
[মধ্য বাং উত্তম বহুব. কর্ত্তৃ বা. চলি
নব্য বাং. " " উভ ব.
মধ্য আসা. উত্তম. বহু ব. কর্ত্তৃবা.
" " ১ম পু. উভ ব. কর্ম্ম বা.]

চলিই
[ম. উড়িয়া
১ পু. ১ ব.
কর্ম্ম বা]
|
চলি
[নব্য উড়িয়া
উত্তম. ১ব.
কর্ত্তৃ বা.]

চলিঅ [মধ্য মৈ. উত্তম পু. উভ ব. কর্ত্তৃ বা.
" " ১ম পু. " কর্ম্ম বা.
|
চলী [নব্য মৈ. উত্তম. বহুব. কর্ত্তৃ বা.
" মগ. " " "
" ভোজ মধ্য. ১ম. " "
|
চলী [" " ১ম উ. পু. " "]
" " তিন পু. " "]

প্রাচ্য অপভ্রংশ

কর্ত্তৃবাচ্য বর্ত্তমান কাল

নির্দ্দেশ ভাব

উত্তমপুরুষ

এক বচন	বহু বচন
চলমি	চলহু

---

(৭) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শুনিউঁ পদকে নির্দ্দেশ ভাবের বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অনুজ্ঞাই অধিক সঙ্গত (প্রাগুক্ত, ৯৩২, ৯৩৪ পৃঃ)।

(৮) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শুনিউ পদের এইরূপ সাধনা করেন—শুনিউ <শুণীঅহু (মাগধী প্রা.)=শ্রূয়তাম্ (সং) (প্রাগুক্ত, ৯২০ পৃঃ)। ইহা অসঙ্গত নহে। কিন্তু বিহারীতে চলুঁ, চলু অনুজ্ঞার একবচনের পদ থাকায় আমরা বহুবচনে চলিউঁ, চলিউ পদ গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যেখানে কর্ত্তা উক্ত হইয়াছে, সেখানে আজ্ঞে পদের সহিত এইরূপ -ইউ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১৬৮, ১৭১, ১৮৩, ১৯৯, ২৩৪ পৃঃ)।

অনুজ্ঞা ভাব

উত্তমপুরুষ

একবচন	বহুবচন
চলমু,	চলিমু
চলউঁ	

কর্ম্ম বা ভাববাচ্য—বর্ত্তমান কাল

নির্দ্দেশ ভাব

প্রথমপুরুষ

একবচন

চলিঅই,

চলিএ, চলী

এক্ষণে আমরা এই প্রাচ্য অপভ্রংশ পদগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

অপ, চলমি < প্রাকৃত, পালি, সং. চলামি

চলহুঁ পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে।

(১) Hoernleএর মতে—অহঁ < -অউঁ < প্রা. -অমু < সং -আমঃ। হকার আগম একবচন অউঁ < প্রা. অমু (অনুজ্ঞা) হইতে পার্থক্যের জন্য এবং ১ম পু. বহু ব. -অহিঁ বিভক্তির আনুরূপ্যের জন্য। তাঁহার অন্যমতে -অহুঁ < প্রা. -অম্হো -অম্হ। কিন্তু তিনি এই প্রাকৃত বিভক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই। (৯) কিন্তু Pischel দেখাইয়াছেন যে, শৌরসেনী, মাগধী ও চক্কী প্রাকৃতে প্রায়ই এবং মাহারাষ্ট্রী ও জৈন মাহারাষ্ট্রীতে কদাচিৎ অনুজ্ঞায় উভয় পু. বহু ব. -অম্হ, -এম্হ বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। Pischel-এর মতে এই ম্হ < -স্ম (সংস্কৃতের লুঙ্ বিভক্তি) (১০)। (২) Pischel Hoernle-র মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন; কিন্তু নিজে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন (১১)। (৩) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে -হুঁ বিভক্তি সর্ব্বনাম -হউঁ হইতে ব্যুৎপন্ন।(১২) পূজ্যপাদ J. Bloch এর মতে একবচন (বট্টউঁ) হইতে পৃথক্ করিবার জন্য বহুবচনে -হ -আগম হইয়াছে (বট্টহুঁ) (১৩)। -অহুঁ < *-অঁহু < *-অম্হু < -অম্হ অসম্ভব নহে। ডক্টর সুনীতিকুমারের ব্যুৎপত্তি অসম্ভব। হউঁ একবচন; কিন্তু -অহুঁ বহুবচনের বিভক্তি। হেমচন্দ্র (৮।৩।১৪৩) ও মার্কণ্ডেয়ের (৬।৮) মতে লটের -থ স্থানে লুঙের -ইথা বিভক্তি হইতে পারে। Pischel দেখাইয়াছেন, লোটের -ম স্থানে লুঙের -স্ম বিভক্তি হইতে পারে। লটের -মস্ স্থানেও লুঙের -স্ম হওয়া সম্ভব। মার্কণ্ডেয় (৯।১০৩) এইরূপ বিধান দেন। রত্নাবলী ও শকুন্তলায় এইরূপ

---

(৯) A. F. R. Hoernle প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ৩৩৫ পৃঃ এবং পাদটীকা।

(১০) R. Pischel প্রণীত Grammatik der Prakritsprachen ৩৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১১) ঐ ৩২৩ পৃঃ।

(১২) পূর্ব্বোক্ত, ৯৩৪ পৃঃ। (১৩) Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris, XXVIII, II, 6.

প্রয়োগ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, Pischel ইহা স্বীকার করেন না। মূলে অনুজ্ঞা স্বীকার করিলেও নির্দ্দেশ ভাবে চলহুঁ প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। (তুং অপভ্রংশ লট্ সি স্থানে —হি বিভক্তি)। J. Bloch এর মত সমীচীন নহে; কারণ, -অউ, -অহুঁ সমকালীন নহে। অউ বিভক্তি অর্ব্বাচীন প্রয়োগ (১৪)।

চলমু পদের প্রয়োগ প্রাকৃতে অনুজ্ঞায় পাওয়া যায়। ইহা চলই : চলউ :: চলমি : চলমু—এইরূপ অনুরূপ সৃষ্টি। অপভ্রংশে চলউ নির্দ্দেশ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই চলউ < চলমু(১৫)। মু স্থানে উ থাকায় চলউ পদটি অর্ব্বাচীন।

চলিমু পদ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে লট্ মস্ স্থানে প্রযুক্ত হয়। অপভ্রংশে লট্ ও লোটে চলহুঁ। লটের চলিম পদের আনুরূপ্যে চলিমু। কিংবা লটের পদই লোটে প্রযুক্ত হইয়াছে। (তুং প্রাকৃতে লট্ ও লোটের উত্তমপুরুষের বহুবচনে চলামো);

চলিঅই < চলীঅই (প্রাকৃত) < চল্যতে (সং)। চলিএ < চলিঅই। চলী < চলিএ। এক সময়ে তিন স্তরের প্রত্যয় **লেখ্য** ভাষায় থাকা সম্ভব। তু পালি -ভি, -হি; -স্মা, ম্হা; -স্মিং, ম্হি; প্রাকৃত (মাগধী) -শ্শ, -(আ)হ; অপভ্রংশ—এণ, এঁ; ইত্যাদি।

পুস্তক-বিবৃতি

1. A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. III, London 1879—J. Beames প্রণীত।

2. A Comparative Grammar of the Gaudian Languages, London 1880—A. F. R. Hoernle প্রণীত।

3 La Formation de la Langue marathe, Paris 1920—J. Bloch প্রণীত।

4. The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta 1926—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

5. Grammatik der Prakritsprachen, Strassburg 1900—R. Pischel প্রণীত।

6. Seven Grammars of the Dialects and Sub-dialects of the Bihari Language, Calcutta 1883-87—G. A. Grierson প্রণীত।

---

(১৪) ধনপালের ভবিসত্তকহায় (১০ম শতাব্দী)। একবচনে -অমি বিভক্তির প্রয়োগ ৬৯, -অউ ১; বহুবচনে -অহুঁ ২৫, অহুঁ ২ (H. Jacobi সম্পাদিত, উপক্রমণিকা পৃঃ ৪১*)। অন্য পক্ষে হরিভদ্রের সনৎকুমারচরিতে (১২ শতাব্দী) একবচনে -মি ৫, অন্য সর্ব্বত্র -অউ; বহুবচনে সর্ব্বত্র -অহুঁ (ঐ সম্পাদিত, পৃঃ ১৬)। Jacobi বলেন, স্বরদ্বয় মধ্যে -হ- আগম (ঐ, পৃঃ ৫)। বৌদ্ধ গানে -অউ নাই।

(১৫) Pischel -অকম্ এইরূপে স্বার্থে ক্ যুক্ত মূল হইতে -অউ ব্যুৎপন্ন মনে করেন। প্রাচীন অপভ্রংশে -অউ পাওয়া গেলে তাঁহার ব্যুৎপত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। কেন না, তখন -অউ < -অমু কদাচিৎ। পরবর্ত্তীকালে স্বরান্তর্বর্ত্তী ম > ব হইয়া পরে অনুনাসিক স্বরে পরিণত হইয়াছে। [Pischel প্রাগুক্ত, ৩২২ পৃঃ]।

7. An Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language, Part. 1, Grammar, দ্বিতীয় সংস্করণ, Calcutta, 1909—ঐ প্রণীত।

8. Linguistic Survey of India, Vol. V, Pt. I, Calcutta, 1903, Pt. II, Calcutta 1903—ঐ সম্পাদিত।

9. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কলিকাতা ১৩২৩—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত।

10. বৌদ্ধগান ও দোহা, কলিকাতা ১৩২৩—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত।

11. বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী, কলিকাতা ১৩১৬,—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত।

12. কীর্ত্তিলতা—মহাকবি বিদ্যাপতি-বিরচিত, কলিকাতা ১৩৩১—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত।

13. অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি—Vol. II, Pt. II. Calcutta 1924—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী-সম্পাদিত।

14. কথাগীতা—গৌহাটি, ১৮৪৪ শক—ঐ সম্পাদিত।

15. নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৮ ভাগ, ১১৯, ১২০ পৃষ্ঠা।

16. Bhavisattakaha—ধনপাল-প্রণীত, Muenchen 1918—H. Jacobi সম্পাদিত।

17. Sanatkumaracaritam, Muenchen, 1921—ঐ সম্পাদিত।

18. On the Radical and Participial Tenses of the Modern Indo-Aryan Languages—G. A. Grierson লিখিত, J. S. A. Bengal, LXIV, 1895, ৩৫২—৩৫৭ পৃঃ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

'বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষ" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

[১] বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। 'চলোঁ—চলি'—এই প্রকারের বর্ত্তমানের রূপগুলির যে উৎপত্তি আমার পুস্তকে আমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি যে, তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। বন্ধুবর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে এবং আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গালার প্রয়োগ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মধ্য-যুগের ও প্রাচীন যুগের বাঙ্গালায় নিম্ন প্রকারের প্রয়োগ হইত :—

বর্ত্তমান, উত্তমপুরুষ, একবচনে—'মই, মোঁ, মোএঁ চলোঁ, করোঁ' ;

বহুবচনে—'আহ্মেঁ চলীএ চলী, করীএ করী'।

বাঙ্গালা ভাষার স্বসম্বন্ধীয় অন্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষা, তথা অপভ্রংশ ও প্রাকৃতের নজীরগুলি প্রশংসনীয় অনুসন্ধানের সহিত অনুশীলন করিয়া এই রূপগুলির যে ব্যুৎপত্তি তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে সমীচীন বলিয়া মনে হয়, এবং আমি এই ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইতেছি :—

একবচনে—'চলামি করোমি' হইতে 'চলমি করমি, *চলম *করম, চলঁ করঁ, চলওঁ করওঁ'র মধ্য দিয়া 'চলোঁ করোঁ' ('অহম্' স্থলে 'ময়া' ও 'মম' হইতে উদ্ভূত অপভ্রংশ 'মই' 'মো' + তৃতীয়ার '-এন' যোগে 'মইঁ' ও 'মোএঁ' প্রভৃতি রূপের উৎপত্তি)।

বহুবচনে ভাববাচ্যের রূপ—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে' > প্রাকৃত 'অম্হেহিং *করীয়তি, *করিয়্যতি, *করীয়তি, করীঅদ' > অপভ্রংশ 'অম্হহিঁ করীঅই' > প্রাচীন বাঙ্গালায় *আম্হহি বা আম্হই, আম্হে করীঅই, করীএ' > মধ্য যুগের বাঙ্গালায় 'আহ্মে (= আম্হেঁ) করীএ, করী'।

'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে' হইতে যে গুজরাটী 'অমে করীএ' হইয়াছে, ইহা ১৯১৪ সালে L. P. Tessitori তেস্সিতোরি দেখাইয়াছিলেন, এবং আমার বইয়ে ৯১০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের উল্লেখ আমি করিয়াছি।

আমার পুস্তকের নবীন সংস্করণ হইলে তাহাতে এই ব্যুৎপত্তিই প্রদর্শিত হইবে।

এই ব্যুৎপত্তিক্রমের শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত ব্যুৎপত্তিক্রমের সহিত তুলনা করিলে সামান্য দুই একটি পার্থক্য দৃষ্ট হইবে।

[২] অপভ্রংশের উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞার একবচনের প্রভাব বিহারীতে যে আসিয়া গিয়াছে, ইহা খুবই সম্ভব। পশ্চিমা হিন্দীতে যে অনুজ্ঞা ও বর্ত্তমান একই রূপে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তথা-কথিত বর্ত্তমানের অনুজ্ঞায় প্রয়োগ হইতে সুস্পষ্ট।

[৩] ৩৩ সংখ্যক চর্য্যাপদে 'আবেশী' (=আইসি) পদকে আমি বর্ত্তমান উত্তমপুরুষের ক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান উত্তমপুরুষ '-ই' বা '-ঈ'-কারান্ত রূপ হইলেই, মূলে তাহা কর্ম্মবাচ্যে প্রযুক্ত বর্ত্তমান একবচনের রূপ বলিয়া ধরিতে হইবে; এই হিসাবে শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত 'আবিশ্যতে'=মাগধী প্রাকৃত 'আবিশ্শদি, *আবিশীঅদি'—প্রাচীন বাঙ্গালা 'আবেশী'—এবম্প্রকার ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে একটু অন্তরায় ঘটে; মাগধী প্রাকৃতের সম্ভাব্য রূপ '*আবিশীঅদি' মাগধী অপভ্রংশে দাঁড়াইবে '*আবিশীঅই', এবং প্রাচীন বাঙ্গালায় তাহার পরিবর্ত্তনের রূপ হওয়া উচিত '*আবিশীএ'। চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালায় অন্ত্য '-অই' অবিকৃত থাকে, দুই এক স্থলে সন্ধির ফলে এই '-অই'কে '-এ' রূপে পাওয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, উক্ত-কারান্ত রূপ 'আবিষ্ট' স্থলে কথ্য ভাষায় প্রযুক্ত '*আবিশিত' হইতে মাগধী প্রাকৃতে '*আবিশিদ', মাগধী অপভ্রংশে '*আবিশিঅ,' এবং তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় '*আবিশী', বর্ণবিন্যাস-বিভ্রাটে 'আবেশী'। অন্ত্য '-ইঅ' অপভ্রংশে থাকিলে, ভাষায় '-ঈ' রূপেই তাহার পরিণতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হিসাবে, ৬ সংখ্যক চর্য্যার 'হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জাণী'-র 'জাণী' পদটিকে 'জ্ঞাত—*জানিত—জাণিদ—জাণিঅ—জাণী' রূপে ব্যাখ্যা করিলেই ভালো হয়—আমার পুস্তকে (৯১২ পৃষ্ঠায়) প্রস্তাবিত 'জ্ঞায়তে > জাণীঅই > জাণী' এইরূপ ব্যাখ্যা ততটা সমীচীন বলিয়া এখন মনে হইতেছে না।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত পাঠ 'বিহরহুঁ স্বচ্ছন্দেঁ' (চর্য্যাপদ ৩৯) আমার গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

[৭] পশ্চিমা-অপভ্রংশের বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষের বহুবচনের '-হুঁ' প্রত্যয়ের সহিত চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালার অনুরূপ '-হুঁ' প্রত্যয়ের সম্বন্ধ আমার পুস্তকে আলোচিত হয় নাই। পরবর্ত্তী বাঙ্গালার অতীত কালের ক্রিয়ায় উত্তমপুরুষে প্রযুক্ত '-হোঁ' প্রত্যয়ের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার এই '-হুঁ' প্রত্যয়ের সাদৃশ্য দৃষ্টে, এবং 'অহম্ > অহকং > হকং > হঅং > হরং > হউ > হোঁ'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুমানে, আমার পুস্তকে প্রাচীন বাঙ্গালার '-হুঁ'-র উৎপত্তি-নির্দ্ধারণের প্রয়াস করিয়াছিলাম; পশ্চিমা অপভ্রংশের বর্ত্তমান উত্তমপুরুষের '-হুঁ' বিভক্তির কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত করা হয় নাই—অনবধানতাবশতঃ (মৎ-প্রণীত Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ৯৮৪ ও ৯৭৫)। মধ্যবাঙ্গালার '-হোঁ' প্রত্যয় ঠিক 'অহম্' হইতে জাত কি না, সে বিষয়ে এক্ষণে আমার সন্দেহ হইতেছে; এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, পশ্চিমা অপভ্রংশের এই বহুবচনের '-হুঁ' প্রত্যয়ের উৎপত্তি কি? শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অপভ্রংশ প্রত্যয় সম্বন্ধে আমি স্পষ্ট কোনও মত দেই নাই। এখনও দিতে চাহি না। তবে একটা অনুমানের কথা বলিয়া রাখি। প্রাকৃতে 'চলামি—চলামো', তাহা হইতে পশ্চিমা অপভ্রংশের প্রথম যুগে '*চলম—চলমু' ও পরে '*চলহুঁ—চলহুঁ', এবং শেষে '*চলউ—চলউ'; পরে মধ্যম পুরুষের বহুবচনের রূপে অবস্থিত '-হু-' কারের